ধূসর পদাতিক

মিহির আচার্য



শুকসারী প্রকাশন
কলিকাতা-১৪

শুকসারী সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

প্রকাশক : শান্তি আচার্য
শুকসারী প্রকাশক
১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলকাতা-১৪

মুদ্রাকর : শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিন্টার্স
১১৫এ, রামমোহন সরণি
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : খালেদ চৌধুরী

দাম : আট টাকা

শ্রীপ্রাণগোপাল নাগ

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের

আলোর সহোদর
দ্বিরাগমন
এক নদী বহু তরঙ্গ
অনিকেতা
অপরাহ্ণের নদী
সম্রাটের মুখ
জোনাকির আলো
ছয় ঋতু বারোমাস
পৃথিবীর বয়স
জীবন নিরবধি
মিহির আচার্যের গল্প
আজকাল পরশু
পারাবারের তীরে
অতন্দ্র প্রহর
দিবস বিভাবরী
ঘরে ফেরার দিন

এক

আঠারো শ তিন।

বিকেলের গৈরিক আলোয় রাজশিবিকা ছুটেছে। সামনে তলোয়ার-উঁচানো পাইকবাহিনী। সিঁদুর চর্চিত মুখ, গায়ে হরিদ্রা-মৃত্তিকা। স্বেদাক্ত কলেবর।

শিবিকার ঝালর তুলে মহারাজা মুকুন্দদেব বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। গভীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখাবয়ব। এই ক'দিনের ঘটনাসম্পাতে তাঁকে অনেক প্রবীণ বয়স্ক দেখাচ্ছে। কী দেখছিলেন তিনি? জনশূন্য ধুধু প্রান্তর, শীতার্ত গাছপালা, আর ওপারের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ঘন বুনট। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। তাকিয়া কোলের ওপর টেনে নিলেন। শেষ রোদে পাইকদের বলিষ্ঠ কঠিন পিঠের ওপর চোখ রাখলেন। ওদের গতি, মাংসপেশীর নাচন দেখলেন। খোলা তলোয়ারে সূর্যের সোনাকে তারা বিঁধে নিয়েছে।

পিছনের শিবিকা সেনাপতির। বকশী জগবন্ধু। জগবন্ধু বিদ্যাধব মহাপাত্র ভবানবীর রায়। নিশ্চুপ নিস্পন্দ পাথরের মতো ধ্যানমগ্ন। বকশী কিছুই দেখছেন না। তাঁর চোখের সামনে ছায়া ছায়া অন্ধকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। বকশী কিছুতেই কটকের দৃশ্য ভুলতে পারছেন না। উৎকলেশ্বর গজপতি মহারাজদের রাজধানী, তাঁদের খেতাব অনুযায়ী রাজ্যের নাম উৎকলদেশ। সেদিন গোটা রাজ্য বিভক্ত ছিল বিশী আর খণ্ডে। মহারাজার হয়ে রাজ্যরক্ষা করতেন খণ্ডপতি। পুলিসী ব্যবস্থা দেখত খণ্ডবত। আর জমিজমা সংক্রান্ত ভার ভুঁইমূলদের ওপর। ইতিহাসের হাতে রঙের পাত্র,

কখনো চড়া রঙ কখনো ফিকে। ইতিহাস নিয়ত রঙ বদলে চলেছে। ইতিহাস অমোঘ নিয়তি। মানুষ তার হাতের ক্রীড়নক। অদৃশ্য ইতিহাস-পুরুষ মানুষের হাতেই তার অভিসন্ধি পূরণ করছে। যুগে যুগে মানুষ কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে, ইতিহাস তাদের মরা হাড়ের ওপর সৌধ রচনা করেছে। মানুষ বদল করে, বাছাই করে, ইতিহাস তার বিজয়রথ অব্যাহত রেখেছে।

বৃদ্ধ গণ্ডোয়ানার সামন্ততন্ত্রের ঘোর অন্ধকার থেকে মুঘলশক্তি ছিনিয়ে আনল প্রদেশটিকে। পনেরো-শ আশি খ্রীস্টাব্দে রাজা তোডরমল আনলেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রথমেই নথিপত্রে পাল্টালেন নাম। উৎকল হল ওড়িয়া। খণ্ড ও বিশী রূপ নিল পরগনায়। খণ্ডপতি বাদ যাবে কেন? খণ্ডপতি হল চৌধুরী, ভুঁইমূল কানুনগো উলায়তি! পরগনার এককেটি অংশ হল তালুক, সরকারী কর্মচারী তালুকদার। গ্রামের প্রধান হল মোকদম।

রাজোয়ারদের জায়গীর নাম পেল কেল্লা, ভুঁইয়া জমিদার।

বকশী জগবন্ধু আবার ভাবলেন। কটকের দৃশ্য তিনি ভুলতে পারছেন না। রাস্তায় লোক নেই, দোকানপাট বন্ধ, বাড়ি গৃহস্থ শূন্য। শ্মশানের মতো খাঁখাঁ করছে। গোরাসৈন্যের আগমনবার্তায় সকলে পালিয়েছে ভীত ত্রস্ত শ্বাপদের মতো। মহানদীর দশ মাইল উত্তরে টাঙ্গিতে। মানুষের পলায়ন দৃশ্যের মতো কুৎসিত কী আছে! জীবনে পলায়ন কাকে বলে বকশী জানেন না। যোদ্ধা বলেই নয়, মানুষ হিসেবেও তিনি জীবনকে মল্লভূমি ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। ভয় কাকে বলে? বকশীর উদাসীন মুখে হাসির আভা বিস্মিত হল। ওরা জানে না যত ভয় পাবে ভয় তত পেয়ে বসবে। পলায়ন ভয়ের সমাধান নয়, প্রশ্রয়। ওই মানুষগুলো রুখে দাঁড়াতে পারত। শহরের এত মানুষ, মানুষের শক্তির চেয়ে আশ্চর্য শক্তি কী আছে। পেছন থেকে তারা গোরাসৈন্যদের আক্রমণ করতে পারত, বাড়ির ছাদ থেকে গুলিবর্ষণ করতে পারত।

আক্রমণ করার মত সুবিধে ছিল তাদের। এই বিদেশী গোরারা কি জানত এই শহরের নাড়ীনক্ষত্রের খবর।

বকশী নিজের মনে বললেন, ভাগ্য। নইলে গোরারা বাঙলার দেওয়ান হবে কেন! ওরা জয়ের টীকা পরে এসেছে।

কী বিচিত্র এই মারাঠাশক্তি। যাদের বিক্রমে একদা নবাব আলিবর্দী বাধ্য হয়ে এদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। বাহুবলে মারাঠারা উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করে। সতেরো-শ একান্ন, আর আজ আঠারো-শ তিনের অক্টোবর মাস। মারাঠাসৈন্য কেবল পশ্চাদ্ধাবন করতে শিখল। কোথাও তারা গোরাদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে এল না। এল মুকুন্দপুরে। ওদের সম্মুখভাগ আক্রমণও করেছিল ঠিক, কিন্তু বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করল খুরদার জঙ্গলে। ভেবেছিল গোরাদের আগে কটকে পৌঁছে প্রচণ্ড বাধা দেবে।

বাধা দিয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেনি। ওদের মনের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই বোধ করি বাহুতে তেমন জোর আসেনি।

কাটজুরি নদীতীরে কয়েকদিনের মধ্যেই গোরারা শামিল হল। ঘাটোয়াল নেই, পালিয়েছে। নৌকোগুলো পর্যন্ত লুকিয়ে ফেলেছে। আশ্চর্য অদৃষ্ট ওদের। একজন মাঝি নৌকো নিয়ে এগিয়ে এল, পার করে দিল সৈন্যদের। বকশী ভাবলেন আসলে মাঝি না এলেও ওরা পার হত। কারণ ইতিহাস-পুরুষই তাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

গোরারা কটকে পদার্পণ করল। আঠারো-শ তিন-এর দশ-ই অক্টোবর। কাটজুরির বামতটে তাঁরা শিবির স্থাপন করল।

তেরো তারিখের রাত্রে দুর্গের দক্ষিণ মুখ লক্ষ্য করে তোপ বসানো হল। পরদিন প্রত্যুষেই গোলাবর্ষণ। বেলা এগারোটার ভেতরে রক্ষণভাগ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। দুর্গের কামান আর কথা বলল না। চল্লিশ মিনিটের চেষ্টায় প্রবেশপথ তৈরি হল। গোরা

সৈন্য ঝড়ের বেগে এক এক করে প্রবেশ করল। দুর্গের অন্দর-দরজাও গেল ভেঙে। দুর্গ এল অধিকারে।

এই সমস্ত ঘটনা কানে শুনেছেন বকশী জগবন্ধু। কিন্তু চোখে দেখেছেন বারবাটি দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে বকশী পুরনো দিনের কথা ভাবছিলেন। কিশোর বয়সে একবার তিনি এই দুর্গে এসেছিলেন। পাথরের মজবুত দুর্গ। চারদিক বেষ্টন করে রয়েছে জলভরা পরিখা। পঁয়ত্রিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ ফুট চওড়া। প্রবেশপথ মাত্র একটি, ছোট্ট একটি সাঁকো পরিখার সঙ্গে সংলগ্ন।

বারবাটি দুর্গ। নিশ্বাস ফেলে আবার ভাবলেন জগবন্ধু। গজপতি রাজাদের একমাত্র স্মৃতিসৌধ। উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা অনঙ্গ ভীমদেব চোদ্দ শতকে এটি নির্মাণ করেন।

ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে বিষাদশূন্যতা বোধ করছিলেন বকশী। মানুষ স্মৃতির মূল্য দেয় না। অথচ স্মৃতি ছাড়া নশ্বর জীবনে অক্ষয় কী আছে। কেউ স্থায়ী বেঁচে থাকতে চায় পাথরের গম্বুজে, কেউ ভাঙে সেই গম্বুজ। বেঁচে থাকার নিয়মই বুঝি এই। স্মৃতিকেও স্থান ছেড়ে দিতে হয় ইতিহাসের নির্মম নির্দেশে।

ইতিহাস! বকশী চমকালেন।

মহারাজের শিবিকা টিলার নিচে অন্তর্হিত হয়েছে।

টিলার চুড়োয় শিবিকা থেকে নামলেন বকশী। জঙ্গলের আড়ালে পশ্চিম দিগন্তে শেষ সূর্যের লোহিত। জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যের আলোয় বকশীর সারা মুখ রক্তরঙিন। কেমন ক্রন্দনের মতো দেখাল তার প্রকাণ্ড চেহারা। গর্বিত, ন্যুব্জ। এখান থেকে দেখা যায় গোটা খুরদা রাজ্য। মহারাজা মুকুন্দদেবের সাধের কেল্লা। রাজপ্রাসাদের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। কোন্‌টা কী পরগনা চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারেন বকশী। রাহাং, সরাইন, চৌবিশকদ। রাহাং-এর গায়ে তার নিজস্ব জায়গীর রোড়াং। বাৎসল্য স্নেহে

জায়গীরের দিকে চোখ নিবদ্ধ করলেন বকশী। সন্তানেরও অধিক, তাঁর একমাত্র আশ্রয়। অন্ন। চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে বকশীর। তিনি মহারাজার সেনাপতি, যোদ্ধা মানুষ, তবু জমির ক্ষুধা তার চাষীদের মতো। বস্তুত তিনি প্রত্যহ জমিতে যান, নিজে রক্ষণা-বেক্ষণ করেন। অন্নদাতাকে যত্ন না-করলে সেবা পাওয়া যায় না। দূরে পাহাড়ের নিচে পাইকদের পল্লী থেকে আগুনের ইশারা দেখা যাচ্ছে। লাল আকাশের নিচে আগুনের চেহারাটা কেমন থমথমে দেখাচ্ছে। জঙ্গলের আগুন। বকশী ভাবলেন। চাষের জমি তৈরির জন্যে ওরা জঙ্গল পোড়াচ্ছে। দাহী চাষ! জঙ্গল দহন করে গাছপালা সাবাড় করে তারপর লাঙ্গল দেবে, ফসল লাগাবে। এইভাবে জঙ্গল পোড়ানো পছন্দ করেন না বকশী। ধীরে ধীরে জঙ্গলগুলি লোপাট হয়ে যাচ্ছে। আর জমিও বেশিদিন খেতির যোগ্য থাকে না। মাটি ক্ষয় হয় নষ্ট হয়, বাপ-পিতামহের পথ থেকে তারা একপাও নড়তে চায় না।

পাইকদের জীবনের এই অন্ধকারের প্রতি কেমন সস্নেহ প্রশ্রয় আছে বকশী জগবন্ধুর। এই পদাতিক বাহিনীর তিনি নেতা। মহারাজার পরেই তারা তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে। মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধার ওপর সব দেবতারই আসক্তি আছে। কিছু লোকের নিরক্ষরতা মূর্খতা সামাজিক প্রয়োজন। তাছাড়া ওরা সৈন্য। সৈন্যদের মস্তিষ্কে বুদ্ধি যত কম থাকে ততই মঙ্গল। বকশী হাসলেন, বুদ্ধি সংশয় আনে। প্রশ্ন আনে, দ্বিধা জাগায়। ওদের চরিত্রের বর্বরতা, নৃশংসতা, আর অকুতোভয় গোটা খুরদা রাজ্যকে রক্ষা করেছে। মারাঠা অশ্বারোহী বার বার পরাভূত হয়েছে এই পদাতিক বাহিনীর কাছে। অন্তত জঙ্গলে পাহাড়ে এদের মতো যোদ্ধা দেখা যায় না।

হঠাৎ পাইকদের সম্পর্কে এত দরদ এল কেন বকশী বুঝতে পারলেন না। শুধুই কি বর্বর এরা! অথচ শান্তির সময়ে এরাই

ঢাল-তরোয়াল ফেলে চাষী বনে যায়। জমির প্রতি ওদের কেমন অন্ধপ্রীতি আছে। জঙ্গল সাফ করে রুক্ষ পাহাড়ে মাটির বুক চিরে ওদের জীবন ধারণের লড়াই আর এক যুদ্ধের মতো। আর, বকশী মনে মনে বললেন, লড়ায়ের মতো পবিত্র বস্তু কী আছে!

'দেবতা, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে—' একজন পাইক বললে।

বকশী শিহরিত হলেন। বিড় বিড় করে বললেন, 'সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।'

সন্ধ্যার ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র রাজ্যে। ডুবল রাহাং, সরাইন, চৌবিশকদ। আর রোড়াং।

বকশী শেষ সূর্যকে প্রণাম করলেন।

সেনাপতির শিবিকা ছুটল।

আবার চিন্তার জালে গুটিয়ে পড়লেন বকশী। এমন কতকগুলি কাজ আছে যা অনিবার্য অথচ মন সমর্থন করে না! যাকে বলে স্রোতে ভেসে যাওয়া, স্রোতের বিপক্ষে গেলে শক্তির বাজে খরচ হয় এবং আখেরে কোনো লাভ হয় না। একে কেউ মূঢ়তা বলতে পারে, কিন্তু অর্থহীন দাম্ভিকতার চেয়ে স্বীকার করে নেয়া ভালো। কাজটা করবার আগে কী চিন্তা করেননি তিনি! করেছেন। দুর্ধর্ষ মারাঠা শক্তির পতন নিজের চোখেই তো দেখলেন। ইতিহাসের নতুন পতাকা এখন গোরা সৈন্যদের হাতে। কর্নেল হারকোর্টকে দেখেছেন তিনি। দেখেছেন ওদের সৈন্যদের। বেঙ্গল বিশ ডিভিশন পদাতিক বাহিনী। মাদ্রাজ নবম ও দশম দেশী পদাতিক বাহিনী। কিছু গোলন্দাজ। বকশী বিশ্বাস করেন না এই সৈন্যরাই বিজয় এনেছে। অদৃশ্য ইতিহাস-পুরুষ এদের হাত দিয়ে তার অভিসন্ধি চরিতার্থ করেছে মাত্র। ইতিহাস অদৃষ্ট ছাড়া কিছু নয়।

কী লাভ হত এই অনিবার্য নিয়তির বিরুদ্ধে গিয়ে। তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে। ওরা তো আর রাজোয়ারাদের স্বাধীনতা কাড়ছে না। খুরদা রাজ্যে মহারাজ স্বাধীন, তাঁর সেনাপতি বকশী

জগবন্ধুও স্বাধীন বইকি। নিয়ম মতো বিজয়ী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে স্বরাজ্যে পূর্ণ ক্ষমতা সম্ভোগ করায় বাধা নেই। রাজস্ব ব্যাপারে মহারাজা সর্বময় কর্তা, বকশীও তাই। সম্বৎসরে একবার সরকারের খাজনা মিটিয়ে দিলেই হল। গোরারা কার্যত তাঁদের পিতৃপিতামহ সূত্রে অর্জিত যাবতীয় অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে।

এ ধরনের ব্যবস্থা তো মারাঠাদের সঙ্গেও ছিল। বকশী নিশ্বাস ফেললেন। বস্তুত কোনো সরকারই জঙ্গলে পাহাড়ে দুর্ভেদ্য খুরদা কেল্লায় দন্তস্ফুট করতে পারেনি। ফলে এ-রাজ্যের স্বাধীনতা ব্যাপারটা সব সরকারের তরফ থেকে এসেছে নিরুপায় স্বীকারে। এবং তা মহারাজার পাইক বাহিনীর শৌর্যেই সম্ভব হয়েছে। জঙ্গলে-পাহাড়ে এ-রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা পদাতিক বাহিনী।

বকশী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন ঃ তাঁর চিন্তাগুলি বার বার একই কেন্দ্রে অবর্তিত হচ্ছে। তাঁর অধীনস্থ পদাতিক বাহিনীর অতীত গৌরবের কথাই তিনি বেশি ভাবছেন। যেন এখন, এই মানসিক অবস্থায় ওরাই একমাত্র সম্পদ, এদেরই মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করা চলে।

পাতলা কুয়াশার আস্তরণ ছিঁড়ে চাঁদ উঠল।

বকশী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর চিন্তাগুলো অতীতের দিকে পিছন হেঁটে চলেছে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি এদেশে মারাঠা শক্তির পদার্পণ। গোটা দেশকে তারা চারটি চাকলায় ভাগ করল। কটক, ভদ্রক, সোরো এবং বালেশ্বর। প্রায় একশো পঞ্চাশটি পরগনা, পরগনাগুলি কয়েকটি মহলে বিভক্ত হল। চাকুলাগুলিতে সরকারি কর্মচারী রইল আমিল, তার ওপর রাজস্ব-সামরিক-বেসামরিক ক্রিয়াকাণ্ডের ভার। পরিবর্তে পেল খাজনামকুব নানকর জমি। তার অধীনে শদর কানুনগো, কানুনগোর নিচে গোমস্তা। গোমস্তা পেল মুহুরী। গোমস্তারা প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙালী, মুহুরী ওড়িয়া। নথিপত্রের বন্ধনে মুহুরীরা হিমশিম খেয়ে উঠল। তারা হিসেব রাখত তালপাতায়,

জমির মাপজোক এবং ওপরতলার ফাইফরমাশ খাটত। গোমস্তারা সই দেগে আর সিলমোহর করে নিশ্চিন্ত। অবশ্য তালুকদারের বকেয়া পড়লে বাধ্য হয়ে তাদের রণক্ষেত্রে নামতে হত বইকি! শদর কানুনগো বেকার হল সতেরো শ বিরানব্বই খ্রীস্টাব্দে। সুবেদার রাজা রাম পণ্ডিত তুলে দিলেন সে-পদ।

কালক্রমে জমিজমা সংক্রান্ত জটিলতার দায় এড়াতে গিয়ে মারাঠারা বিষয়টাকে সহজ করে নিয়ে এল। যার টাকার থলি বেশি তার সঙ্গেই ব্যবস্থা শুরু করল। আর, এ কাজে মধ্যস্থতা করতে পারে মোকদম। আমিল কর্মচারী তাদেরই শরণার্থী হল।

এটা উনিশ শতকের গোড়ার কথা।

মারাঠা-সূর্য আজ অস্তমিত। বকশী জগবন্ধু দূরের দিগন্তের বেদনা নিয়ে তাদের দীর্ঘ শাসনকালের হিসেব নিতে পারছেন।

আশ্চর্য, বকশী স্বগত উচ্চারণ করলেন: সুদীর্ঘ মারাঠা শাসনে তারা দস্যু ছাড়া অন্য সুনাম অর্জন করতে পারেনি। রাজ্য পরিচালনার রাজকীয় কৌশল ছিল লুণ্ঠন। সুদূর বেরার থেকে ভোঁসলা বংশ শাসন করত এই রাজ্য। পরোক্ষে রাজস্বকর্তারাই সর্বেসর্বা। তারা জনসাধারণকে বোঝেনি, বোঝবারও চেষ্টা করেনি। তাদের নিষ্ঠুরতা স্বেচ্ছাচার প্রজাকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। কর্তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অর্থ। অর্থ-মৃগয়ায় সততা নীতি বিসর্জিত হল।

বকশী দিবালোকের মতো পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছেন।

মানুষ প্রতিনিয়ত অনিশ্চিত ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। যখন তখন নীলাম ডেকে চাষীদের স্বার্থ না-দেখে জমির বন্দোবস্ত হয়েছে! ভাগ্যবান বলতে হবে যারা সম্বৎসর নিরঙ্কুশ জমি ভোগ করেছে। আশা-আশংকা-সংশয় আর ভীতির দোলায় দুলতে দুলতে তাদের জীবন কেটেছে। কখন কোথা থেকে কিসের মূর্তি ধারণ করে উৎপাত আসবে কে জানে। প্রচণ্ড বর্ষার পীড়ন, হঠাৎ যুদ্ধবিগ্রহ

কি দস্যুতা তাদের পরিশ্রমের ফসলকে নষ্ট করে দেবে না, কে বলতে পারে !

সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে মানুষের চোখে ঘুম নেই। সহসা আবির্ভূত হল হোলকরের সৈন্য, আর পিছনে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় সিন্ধিয়ার সৈন্য। ফসলের খেতে শকটের বলদ ছেড়ে দিল, হাতিগুলো জল সরবরাহ নষ্ট করে ফেলল। প্রতিবাদের বেতন মৃত্যু। শুধু যুদ্ধের সময় কেন শান্তিপর্বেও বিপক্ষ সৈন্য জীবনধারণের গরজে জনপদে একটু লুটপাট করত।

হতভাগ্য জনসাধারণ ভাগ্যের হাতে মার খেতে-খেতে অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ল। সৈন্যরা আসছে শুনে তারা গ্রাম ছেড়ে দলে দলে পালাত জঙ্গলে-পাহাড়ে। দিনের আলোয় মুখ দেখাত না। চাঁদ উঠত আকাশে, ওরা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসত কোটর ছেড়ে। আর চাষের মরিয়া স্বপ্ন বুনত।

এরপর ছিল পাহাড়িয়াদের উৎপাত। পাকা ফলের বাগানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিদের মতো তারা উড়ে পড়ত !

আত্মরক্ষার জৈবিক প্রবৃত্তিতে একদিন মানুষ যূথবদ্ধ হতে শিখল। বাঁচবার কৌশল আয়ত্ত করল। বড় বড় পল্লীতে তারা আস্তানা গাড়ল। মাটির কেল্লা গড়ল। রণসাজে সজ্জিত হয়ে নামল খেতে —গ্রাম থেকে অনেক দূরে, রাত্রির অন্ধকারে একটি বাতিও ভুল করে জ্বলত না। এর নাম দিয়েছিল তারা বে-চিরাগ। দুঃখের লোনা জলে ভীতি আর বেদনার ভেতরে যে-ফসল জন্ম নিল তারও অগ্নিপরীক্ষা হত।

বকশী ভাবলেন : বছরের গোড়ায় জমাজমিতে বহু পরিশ্রমে ফসল ফলিয়ে একদিন চাষী দেখল তার পাকাধানের জমি নীলামে ডেকে নিল কোনো দালাল। তার বোনা ফসল উঠল গিয়ে পরের ঘরে।

কখনো কর্তারা সৈন্যদের বকেয়া মেটাতে এক-একটি গ্রামকে

উৎসর্গ করে দিত। লেলিয়ে দিত বলা যায়। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। অভিজ্ঞতা চাষীকে প্রাজ্ঞ করেছে। তারা সব সময় অভাবদশায় থাকত কিংবা অভাবকে তুলে ধরত। ফসল রাখত লুকিয়ে এবং চাষ করতে নারাজ হত।

কিন্তু, এক সময় তাদের হারতে হত। ক্ষুধা বৈশ্বানরের মতো লেহি লেহি জ্বলত।

ক্ষুধা-কবলিত মানুষের লজ্জা ও অপমানের চেহারা বকশী নিজে দেখছেন বইকি। একমুঠো ভাত আর শাকপাতার একাহার অনশনে পরিণত হত। মার-খাওয়া জন্তুর মতো শীতল কান্না গ্রামের আকাশকে রাখত ভারি করে। একেক সময় ওদের বেঁচে থাকাটাই অতিরিক্ত বাহাদুরি বলে মনে হত।

বস্তুত, বকশী আবার ভাবলেন: তাদের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল। হয় চাষ করো না হয় মরো। জায়গীরদারের গুপ্তচর খবর পরিবেশন করত জমা নেবার উপযুক্ত কৃষক কে!

গ্রাম্য মহাজনদেরও কী অব্যাহতি ছিল! সরকারের টিকটিকি ছিল দেশময় ছড়ানো। তারা জোগাড় করত খবর। কার হাতে কত টাকা আছে। আর, খবর এলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করবার ছলের অভাব হত না। তোমার ধন আছে, এটাই তো অপরাধ। এবং অভিযোগে সে-দাবী প্রমাণিত হবে, জানা কথা। পারিবারিক অসম্মানেও যদি গায়ে ছ্যাঁকা না লাগে, তাহলে তাকে বেঁধে রাখো। পণের বিনিময়ে মুক্তি অর্জন করার খোলা রাস্তা আছে।

মারাঠাদের অর্থগৃধ্নুতা এমন আকাশপ্রমাণ হল যে একসময় তারা চিন্তা করল—রাজ্যের আর্থিক কল্যাণের জন্যে বিধবাদের বেচে দেয়া চলে কিনা। তামাম গৃহস্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক-চতুর্থাংশ দাবি করা যাবে কিনা। কিংবা কন্যা-বিক্রি টাকার একভাগ গ্রহণ করা চলবে কিনা।

বকশীর জানা খবর ঃ পুরসিয়া নামে একটি স্ত্রীলোককে নীলাম ডেকে সাত-টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল।

মানুষ দুঃশাসনের অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল। বসতবাড়ির জন্যে কর। অস্থায়ী ছাউনিতে বাস করলেও কর। কর খাদ্য, মাংস প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে। বিয়েতে বাদ্য বাজালে কর, উৎসবের দিনে কর। কোনো কিছু বেচতে গেলে চাই কর। ফসলের জন্যে, বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা জানালেও কর। কর পুষ্করিণী খননের জন্যে, মন্দির মঠ নির্মাণের জন্যে।

কিন্তু, এসব কথা ভাবছেন কেন বকশী।

অন্য রাজোয়ারার মতো খুরদা রাজ্যের সমস্যা আলাদা। শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ শাসনের অবকাশ নেই এখানে। মহারাজা সর্বময় কর্তা, আর তাঁর পরেই বকশী।

আজ আছে পদাতিক বাহিনী। বকশীর পুরু ঠোঁটে বিচিত্র কৌতুক খেলে গেল। তার চিন্তাগুলো আবার একই খাদে গড়িয়ে পড়ে।

যোদ্ধা ওড্র-জতির যোগ্য বংশধর এই পাইকরা। হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু-রাজাদের সেনাবিভাগে সেবা করে এসেছে। একদা তাদের জাতিগত নাম তারা গোটা প্রদেশকে দান করল। ওড্র হল ওড়িয়া, উড়িষ্যা। এরাই হল উড়িষ্যারাজের পদাতিক বাহিনী এবং কালক্রমে সমস্ত পদাতিক বাহিনী অপভ্রংশে আখ্যা পেল পাইক। শিবাজীর মারাঠা সেনাবাহিনীতেও ছিল এই পাইকরা।

শুধু খুরদা রাজ্যে নয়—বানপুর, পিপলি, পুরী, কুজাং, কনিকা পর্যন্ত এরা ছড়িয়ে রয়েছে।

বকশী ভাববেন ঃ বহু জাতি-উপজাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে পাইকরা। মূলত এরা চাষা উপজাতির বংশধর। সমাজের নীচের তলার মানুষেরাই এসেছে এদের মধ্যে। আছে খন্দরবাসী কোন্দুরা, পত্রে আচ্ছাদিত পানেরা, অরণ্যবাসী বউরিগণ। এ ছাড়াও

রয়েছে খণ্ড উপজাতি, মুসলমান আর তেলিঙ্গারা। তলোয়ারধারী খণ্ডবতরা সাধারণত নেতা, আর পাইকরা অনুগামী।

কর্মবিভাগের সঙ্গে এরা তিনটি শ্রেণীতে পরিণত রয়েছে। বকশী মনে করতে পারলেন। একদল দুর্গ আর রাজবাড়ি পাহারায় নিযুক্ত। হাতে বিরাট ঢাল আর দীর্ঘ ঋজু তলোয়ার। স্থানীয় নাম খণ্ড। এরা প্রহরী। আর একদল পুলিসী কাজে নিযুক্ত। ঢাল-তলোয়ারের সঙ্গে তাদের অস্ত্র রয়েছে ধনুক। এদের নাম ধেনকিয়া। শেষের দল বনুয়া বা বন্য বলে পরিচিত। হাতে দেশী বন্দুক। যুদ্ধ-অভিযানের জন্য এরা তৈরি থাকে।

বকশীর চিন্তাধারা হোঁচট খেল।

দরবার-ঘরের সামনে শিবিকা থেকে অবতরণ করলেন তিনি।

অন্ধকার। অন্ধকার সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করল। খুরদা রাজ্যে অন্ধকার কী আজ বেশি ঘন হয়ে জমেছে। নাঃ শীতকালের রাত্রি এমনিতেই নিষ্প্রভ নিস্পন্দ হয়ে আসে। বকশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এগোলেন অন্দরের দিকে। তাঁর সংসার, তাঁর বাড়ি, হঠাৎ কেমন দূরত্ব বোধ করলেন তিনি। একটা গ্লানি, দেহমন খিন্ন, ক্লান্তি। আজ রাত্রে বাড়িতে কেউ যদি জেগে না থাকে! একটি প্রাণীও নয়! কারুর মুখদর্শন করতে, বাক্যালাপ করতে ভালো লাগছে না।

বকশীর শৌর্য-বীর্যের অন্তরালে একটি গুহায়িত মানুষ আছে। চিন্তাশীল দার্শনিক মানুষ। এবং অদৃষ্টবাদের শেকলে জড়ানো।

'কে ?'—বকশী অকারণ চমকে উঠলেন।

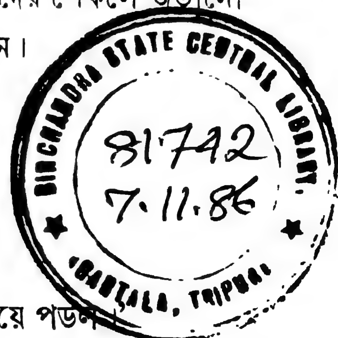
'আমি।'

স্ত্রী সত্যভামা।

'এত দেরি হল ফিরতে ?'

বকশী বললেন, 'হুঁ—'

'মেয়েটা কাঁদতে-কাঁদতে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।'



'কেন, কাঁদছিল কেন?' অন্যমনস্ক জানতে চাইলেন বকশী।

'বা রে! তুমি কটক থেকে ওর রুপোর নাকছাবি আনবে, বলেছিলে না?'

'নাকছাবি!' বকশী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভুল হয়ে গেছে। ঠিক ভুল নয়, সময় পান নি। সময় পেলেও কোথায় নাকছাবি পেতেন তিনি! লোকজনপরিত্যক্ত দোকানপাট বন্ধ শহরে। মেয়েটা সকালে উঠে কাঁদবে।

সত্যভামা বললেন, 'একটু বিশ্রাম করে নাও। আহারের ব্যবস্থা করি।'

বকশী বললেন, 'আজ রাতে আর কিছু খাব না।'

'সাহেবরা খুব খাইয়েছে বুঝি? কী রকম খাতির হল মহারাজের?'

বকশী তিক্তগলায় উচ্চারণ করলেন: 'খাতির!' হাসলেন। কী হবে সত্যভামাকে রাজনীতির কথা বলে। আশ্চর্য এই গোরারা। কর্নেল হারকোর্ট। কর্নেলের তাচ্ছিল্যের হাসি মনে আগুন ছড়ায়। কর্নেল বললেন: 'উড়িষ্যায় সত্যিকার রাজা কেউ নেই। এরা আসলে মোকদম। উত্তরাধিকারসূত্রে এরা কেবল খাজনা আদায়ের অধিকার পেয়ে এসেছে। জমির ওপর তাদের কোনো স্বত্ব নেই। এরা সরকারী কর্মচারী মাত্র।' অতএব— আনুষ্ঠানিকভাবে রাজাদের স্বীকার করে নেয়া। মহারাজের মলিন মুখের দৃশ্য এখন আবার মনে পড়ল বকশীর। দৃশ্যটা ঝেড়ে ফেলবার প্রয়াস পেলেন তিনি। সারাদিনের ধকলের পর স্নায়ুকেন্দ্র অবসিত, মস্তিষ্ক নিরেট।

'আমাকে আজ একটু একলা থাকতে দাও।' বকশী শয়নঘরে প্রবেশ করলেন।

দুই

মাঝখানে চওড়া পথ। আর দুপাশে চালাঘর।

শীতকালের অবসন্ন প্রভাতী রোদে বকশী জগবন্ধু ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। কাছেপিঠে পাইকদের বসতি' পল্লীতে লোক নেই। বোধহয় আজ কোনো উৎসব ওদের। মণ্ডপের সামনে খোলা জমিতে ওরা ভিড় করেছে। দূর থেকে ওদের গলায় কলরব শোনা যাচ্ছে।

মোড় ঘুরতেই ওদের জমায়েত চোখে পড়ল।

বকশী ঘোড়ার রাশ আলগা করলেন।

তাঁকে দেখতে পেয়ে মাঝি পটমুণ্ডিয়া এগিয়ে এসে গড় করল।

'ভালো আছো মাঝি?'

মাঝি হাসল। উঁচুদরের হাসি। তার সাজপোশাকে আজ ঘটা। পরনের ধুতির সঙ্গে মাথায় পাগড়ি। কোমরে তলোয়ার।

বকশী ঘোড়া থেকে নামলেন।

একদিকে গোল করে দাঁড়িয়েছে গাঁয়ের পুরুষ নারী আর শিশুর দল। আড়াআড়ি করে দুটো বাঁশ পোঁতা। দুই জাগ্রত দেবতা। ধরণী আর ধর্ম। যে মাটি আঁকড়ে বেঁচে-থাকা তিনি তো দেবতা বটে। সাক্ষাৎ ধরণী। আর ধর্মদেবতা পরকালের বিচারক। পুরোহিত পুজো করছে। দেবতার জন্যে বলি রয়েছে বাঁধা। একটি মহিষ, ভেড়া আর মুরগী।

সম্মানিত অতিথির জন্যে উপযুক্ত আসন এল। বকশী বসলেন। বসে বসে পিতৃব্যস্নেহে দেখলেন এদের উৎসব। সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুখ দেখে কে ভাববে ওদের অন্য জীবন আছে। ওরা কি

জানে দেশের সরকার পালটেছে। গোরারা এদেশের রাজা হয়েছে। ওদের এই কৌতূহলহীন জীবন এক ধরনের সুখের নির্মোকে তাদের তুষ্ট রেখেছে। রাজা বদলানোর রাজনীতি নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই। বেশ আছে ওরা।

মাঝি বললে, 'দেবতা নাচ দেখবি?'

বকশী মাথা নাড়লেন।

যুবকযুবতীরা দূরে দলবদ্ধ হয়ে নৃত্য করছিল। ওরা এবার বকশীর কাছে এগিয়ে এল। মেয়েদের খোঁপায় বুনো ফুল, গা ভরতি উলকি আর হাতজোড়া গহনা। হাতে হাতে তালি। গহনার ধাতব ঝংকার। যুবকদের চোখ লাল। নৃত্যের তরঙ্গে শরীর দুলছে।

বকশীর মনে হল কালো মসৃণ প্রস্তরে কে যেন স্বপ্ন উৎকীর্ণ করছে। বর্তুল বাহু, গ্রীবা, শ্রোণীদেশ। স্বেদঘর্মের অভিষেকে সে স্বপ্নকে বিদ্যুতের মতো ঝলসাতে দেখলেন বকশী। তাঁর রক্তে দোলা লাগে, ছন্দ জাগে। আর রাজকার্যের গুরু দায়িত্বের ঊর্ধ্বে ধাবমান পলাতক রসের উদ্বোধনে কেমন বৈরাগ্য জাগে। বকশী নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ওপারে সবুজ ঘন বন, দূরে খেতের ফসল। সবুজ রঙে চোখ ভরে আসে বকশী জগবন্ধুর। সমস্ত ইন্দ্রিয়ে উদ্ধত স্বাস্থ্যের জোয়ার। তিনি যদি নেমে আসতে পারতেন ওদের সঙ্গে, ওদের মাঝখানে, এই আনন্দের ভোজে। পারেন না। এরাও তাকে পাথরের দেবতা বানিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সেই দেবতার ক্ষুধা নেই তৃষ্ণা নেই আনন্দ নেই। বকশী এখন বুঝতে পরেলেন বৈকুণ্ঠের দেবতারাও কেন মাঝে মাঝে মানুষ হবার লোভে মর্তে নেমে আসেন।

হঠাৎ চোখে পড়ল বকশীর। এই আনন্দের যজ্ঞে নিরানন্দ নিঃসঙ্গ মেয়েটি বসে। পরনে নতুন শাড়ি, আদুড় গা। হাঁটু ভাঁজ করে, হেঁটমুখে বসে। মেয়েটি নিঃশব্দে কাঁদছিল কিনা, বোঝা গেল না।

'দেবতা—' মাঝি এসে দাঁড়াল।

'এই যে।' বকশী সংক্ষিপ্ত জানান দিলেন।

'নাচ পছন্দ হয়েছে তো দেবতা ?'

'হু।' বকশী মাথা নাড়লেন। 'মাঝি'

'আজ্ঞা করুন দেবতা।'

'ওই মেয়েটি, ওর কী হয়েছে ?'

মাঝি বললে, 'ও নুরান। আইবুড়ো মেয়ে, বর জোটেনি। পঞ্চজনে পাঁচ কথা কয়। ওর আজ বিয়ে।'

বকশী জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাত্র ?'

মাঝি বললে 'পাত্র আর মিলছে কই। ওই ধনুকের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে।'

ধনুক। বকশী দেখলেন ফুল পাতায় একটি ধনুককে বরবেশে সাজানো হয়েছে।

মাঝি বললে, 'আইবুড়ো নাম তো ঘুচবে। আর তো কানাকানি হবে না।'

'তারপর ?' বকশী নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন।

'তারপর বর জুটলে আগের বিয়ে ভঙ্গ করে ওর আবার বিয়ে হবে।'

'ও কাঁদছে কেন ?'

'যুবতীধরম।' মাঝি মুখ টিপে হাসল। 'কে জানে ওদের মন।'

বকশী এবার উঠে দাঁড়ালেন। বেলা বেড়েছে। একবার নিজের মৌজা ঘুরে আসবেন। বকশী ঘোড়ায় সওয়ার হলেন।

ঘোড়া ছুটল।

দুধারে বন। টিলা পাহাড়।

সূর্য তির্যক্ কিরণ বিতরণ করছে।

বকশী আবার ভাবলেন : এদের মতো জীবনকে কেন সরল-ভাবে নিতে পারেন না। গতকালের সূর্যোদয়ের সঙ্গে আজকের

সূর্য-ওঠার কোনো তফাত নেই। রোজই এক সূর্য ওঠে একই সূর্য অস্ত যায়। এরই মধ্যে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, বিবাহ আছে, উৎসব। আইবুড়ো মেয়েটার করুণ মুখের দৃশ্য এখন মনে পড়ল। ধনুককে বর কল্পনা করে তার বদনাম ঘুচবে। তারপর যদি কোনোদিন রক্তমাংসের বর দেখা যায়, বিবাহ বিচ্ছেদ করে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসবে। কিন্তু মেয়েটি কাঁদছিল কেন! সে কি সত্যই বিয়ের নামে এই ছেলে-খেলায় ধিক্কৃত, অপমানিত। যুবতীধরম। হাসলেন বকশী। হঠাৎ নিজের মেয়ে পার্বতীর কথা মনে পড়ল। কটক থেকে ওর একজোড়া নাকছাবি আনতে পারেন নি। বকশী কাশলেন, কেশে গলা ঝেড়ে আবেগ তাড়াবার চেষ্টা করলেন।

ঘোড়া কেশর ফুলিয়ে ডেকে উঠল।

বকশী সামনে গাছের নিচে চোখ পড়তেই বিস্মিত হলেন। তৃণ-লতায় জায়গাটি নির্জন। ঝোপে ঝাড়ে বাঘ আর ময়াল সাপ থাকা অসম্ভব নয়। এই সকালেও রোদ এখানে কুণ্ঠিত এবং ছায়াচ্ছন্ন।

যুবকটি গাছতলায় চিত হয়ে শুয়ে। উদাসীন, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অনবহিত। যেন ভূত ভবিষ্যৎ জানা হয়ে গিয়ে সে নির্বিকল্প হয়ে শুয়ে আছে। সারা দেহ রুক্ষ, চোখমুখ লাল, কেমন মার-খাওয়া সর্বস্ব-খোয়ানো শ্বাপদের মতো চেহারা।

বকশী ঘোড়া থামালেন।

তাকে কেউ লক্ষ্য করছে অনুভব করেও যুবকটি আকৃষ্ট হল না।

বকশী কৌতুক বোধ করলেন।

'তুমি কে?'

উত্তর নেই।

'কী, জবাব দেবে না বুঝি?' বকশী যেন নতুন খেলায় মেতে উঠলেন: 'জানো আমি কে?'

যুবকটির গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠল।

বকশী বললেন, 'আমি জানতে চাইছি এখানে তুমি কী করছ?'

যুবকটি বললে, 'শুয়ে আছি।'

'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। গ্রামে উৎসব ছেড়ে দিয়ে এখানে এই নির্জনে—'

'কি হবে আমার উৎসবে? আমি চাইনে, কাউকে চাইনে।'

যন্ত্রণাক্লিষ্ট গলায় যুবক আর্তনাদ করে উঠল।

বকশী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে তো ওরা চাইতে পারে।'

যুবক বললে, 'না।'

বকশী বললেন, 'অভিমান করে দূরে সরে এলে তো তুমি হারো। আর, ওরা তোমাকে হারাতেই চায়। তুমি শক্তিমান যুবক তোমার এই দুর্বলতা শোভা পায় না।'

যুবকটি শরীর তুলে জেদী গলায় বললে, 'আমাকে আপনি কি করতে বলেন?'

বকশী বললেন, 'তোমার সমস্যা না জানলে আমি কী পরামর্শ দিতে পারি বলো। তোমার নাম কি?'

'দীপ।'

'আর তোমার জীবনে এত অন্ধকার—' বকশী হাসলেন: 'বলবে না আমাকে তোমার সমস্যা?'

'আপনি শুনে কী করবেন?'

'যুবক, তোমার পিতা আছে?'

'নেই।'

'পিতৃস্নেহ তুমি জানো না।' বকশী নিশ্বাস ফেললেন: 'ওই আকাশ দেখছ, পিতৃস্নেহ ওই আকাশের মতো বিরাট উদার। নিঃসঙ্কোচে তুমি আমাকে বলতে পারো।'

যুবক কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বললে, 'আমি জানিনে আপনাকে বলা উচিত হবে কিনা।'

বকশী বললেন, 'আকাশের কাছে কিছু লুকানো যায় না। আচ্ছা, আমি তোমাকে প্রশ্ন করি। সত্য হলে স্বীকার করবে।'

যুবক ঘাড় নিচু করল।

বকশী বললেন, 'আজকে উৎসবের দিনে একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।'

যুবক বিবর্ণ গলায় বললে, 'জানি। ওর নাম মুরান। কিন্তু ও কি বিয়ে। ধনুকের সঙ্গে!'

বকশী বললেন, 'মেয়েটি কাঁদছিল। বলতে পারো ওর কিসের দুঃখ?'

যুবক মুখ গোঁজ করে বললে, 'আমি কি করে বলব?'

বকশী নীরবে হাসলেন। পরে বললেন, 'আমার মনে হয় একটা যুবক ওর জন্যে বনে অপেক্ষা করছে এই ভেবেই সে কাঁদছিল। তোমার কী মনে হয়?'

যুবক বললে, 'আমি জানিনে।'

বকশী এবার ধমকালেন: 'দীপ! সত্যকে বহন করো, শক্তিমান হও।'

যুবক ঘা খেয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। 'হ্যাঁ আমি, আমি—'

'তুমি মুরানকে ভালোবাসো।' বকশী বললেন, 'তবে তুমি ওর পতি হলে না কেন?'

দীপ বললে, 'গাঁয়ের আপত্তি, মাঝির আপত্তি—'

'কেন?'

'ওর শরীরে আমার মা'র বংশের রক্ত আছে।'

বকশী এবার চিন্তিত হলেন। সমস্যার অন্ধকারে তিনি খেই খুঁজতে লাগলেন। তারপর যেন আলো পেয়েছেন এইভাবে বললেন: 'তোমাদের সমাজে তো এমন বিয়ে হয়েছে।'

'হবে না কেন।'

'তবে?'

'আর হবে না। এখন থেকে হবে না। নাকি এতে গাঁয়ের অমঙ্গল হয়। কিন্তু আমি নুরানকে না-পেলে বাঁচব কি করে। একসঙ্গে আমরা খেলেছি, বড় হয়েছি, হৃদয় দেয়া-নেয়া করেছি।'

বকশী কিছুক্ষণ আহত যুবককে লক্ষ্য করলেন। বোধ হয় চিন্তাগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। তারপর ধারালো গলায় বললেন, 'ঘোড়ায় চড়তে পারো?'

যুবক অবাক হল। বললে, 'পারি।'

'তোমার ঘোড়া আছে?'

'নেই।'

'সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি তোমাকে ঘোড়া দেবো।'

'কিন্তু...'

'পুরীর রাস্তা চেনো তুমি?'

'চিনি।'

'রাত্রির অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবে। এদিকের ব্যবস্থা আমি করে রাখব। পুরীতে তোমরা কী করবে তোমরা জানো।'

'তোমরা!' যুবক আবার অবাক হল।

'হ্যাঁ। নুরানকে তোমার ঘোড়ায় তুলে নেবে।'

'আপনি।' যুবকের বাক্‌স্ফূর্তি হল না।

'কেন? তুমি বললে না ওকে নাহলে বাঁচবে না? কেমন, তুমি বাঁচতে চাও তো?'

যুবক স্তব্ধ গলায় বললে, 'আপনি আমার জন্যে এসব করবেন কেন?'

বকশী হাসলেন। 'বৃথা বাক্যালাপে সময় নষ্ট করো না। তোমার অনেক কাজ বাকি। ওঠো। অভীষ্ট লাভ করো। উদ্যোগী

পুরুষ লক্ষ্মীকে পায়।' বকশী ঘোড়ায় চাপলেন। 'মনে থাকে যেন তোমার জন্যে ঘোড়া তৈরি থাকবে।'

'কিন্তু—'

'ধরো আমার শক্তি আছে তাই তোমাকে এটুকু সাহায্য করলাম। আচ্ছা চলি।'

যুবক ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ জ্বলছে। আশা আনন্দ উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপছে।

এখান থেকে উৎসবের বাদ্য শোনা যাচ্ছে। আর মানুষের যৌথ কণ্ঠস্বর দূরাগত ঝড়ের মতো গুঞ্জন তুলেছে।

দীপ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। একটু এগোলে ঝিরঝিরে ঝরনার স্রোত। ঝরনাতলার নির্জনে দাঁড়াল যুবক। শ্যাওলা সবুজ জল পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ছোটো ছোটো কাঁকড়া জলকেলী করছে।

যুবক জলে প্রতিবিম্ব দেখল। আপন মনে খলখল করে হাসল। তারপর পরিধেয় ত্যাগ করে নেমে এল শীতল জলের আহ্বানে।

দুপুর গড়াল। পাহাড়ে বিকেলের দীর্ঘ ছায়া। জ্বর জ্বর আচ্ছন্নের মতো দীপ সারাদিন কাটাল। অধৈর্য ব্যাকুলতা তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো রক্তাক্ত করল ওর চেতনাকে। ভালোবাসার মুখকে ভাবল অনেকক্ষণ। ফিসফিস করে বললে: নুরান, নু-রান—

তারপর সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আকাশে উঠল চাঁদ।

দীপ উঠে পড়ল। পল্লীর পথ এখন নির্জন।

'কে যায়?'

'আমি দীপ—'

'উৎসবে দেখিনি তোকে?'

'না।'

'শরীর ভালো নেই?'

'হুঁ—'

রাত্রি ঘন থেকে ঘনতর হল।

দীপ পোশাক পরে নিল। মাথায় শিরস্ত্রাণ। কোমরে তলোয়ার।

এখন এই রাত্রে নুরান কী করছে? নিঃশব্দে ওদের বাড়ির পিছন দরজায় এসে দাঁড়াল দীপ। কান পাতল বেড়ার ওপর। মৃদু শব্দ করল আঙুলের। একবার দুবার তিনবার। এই সংকেত জানে নুরান, এই আহ্বানকে উপেক্ষা করবার শক্তি তার নেই।

ঝাঁপ খুলল।

নুরানের মুখ।

'তুমি!'

'এসো। কথা আছে।'

'ওরা জানতে পারবে।' নুরান কাঁপল, দুলল শরীর, কণ্ঠস্বর।

'ভয় নেই। এসো।'

নুরান আপাদমস্তক বস্ত্রে ঢেকে বেরিয়ে এল।

দীপ ওর হাত ধরল। ও কাঁপছে, টলছে।

দীপ ওকে শক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল। নুরানের নরম শরীরের কাঁপুনি নেশার মতো আচ্ছন্ন করল যুবককে।

'নুরান, নুরান, আমার নুরান....'

'আমাকে ছেড়ে দে—'

'নুরান, নুরান···'

'আমার পাপ হবে, আমি আমি বিবাহিত—'

'পাপ! পাপ-পুণ্য আমি মানিনে। আমার নুরানকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না। যদি নরকে যেতে হয় তাও আমি যাব।'

নুরান কাঁদে।

দীপ বললে, 'এখুনি আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে। আমি সব ব্যবস্থা করেছি।'

নুরান ভয়ার্ত স্বরে বললে, 'কো-থায়?'

'অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে। আমরা ঘর বাঁধব। ভালো-বাসব। কেউ আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না।'

'আমার ভয় করে। ওরা জানতে পারলে আমাদের খুন করে ফেলবে। তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ভুলে যাও।'

'পারব না।' দীপ হাঁটু ভেঙে বসল। 'তার আগে আমাকে খুন করো। নাও এই তলোয়ার।'

নুরান ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। 'আমি জানিনে, কিছু জানিনে, আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করো। আমি আর ভাবতে পারিনে।'

'তবে চল।'

গাঁয়ের নির্জন রাস্তা ধরে ওরা ছুটল। মাথার ওপরে মায়াবী চাঁদ শুধু ওদের অনুসরণ করল।

নিশুতি পুরীর রাস্তা দুঃসাহসী প্রেমিকযুগলের অশ্বের খুরে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

চোখে ওদের স্বপ্ন। ঘর-বাঁধার। নতুন আকাশ, নতুন পৃথিবী।

'আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি—' নুরান বললে: 'কোনোদিন ভাবিনি সমুদ্রে যাব।'

মাথার ওপরে মুগ্ধ জ্যোৎস্না। ছেঁড়া হালকা মেঘ। কেবল স্বপ্ন, অগণন, অজস্র।

একটা রাতজাগা পাখি ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল।

বকশী চমকে উঠলেন। এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন ওদের বিদায়ী গতির উদ্দেশে। অশ্বখুরের শব্দ ক্ষয় হতে-হতে মিলিয়ে গেল একসময়। নবীন যৌবনের উত্তাপ বোধ করলেন বকশী। ওদের যাত্রা নিষ্কণ্টক হোক, শুভ হোক।

বকশী এই দ্বিপ্রহর রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন। ওরা প্রথম উষায় জগন্নাথধামে পৌঁছেছে। ঘোড়া থেকে নেমে হয়তো ওরা হাঁটছে আশ্রয় আর নিরাপত্তার জন্যে। মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওরা

হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে মন্দির ছেড়ে সমুদ্র-সৈকতে। নীল উচ্ছ্বসিত সমুদ্র। পূর্বাচলে রক্তাম্বর সূর্যের প্রকাশে দিগন্ত লালের তীর ছুঁড়ে মেরেছে। হয়তো মেয়েটি বালিশয্যায় শুয়ে পড়েছে। ওর চোখে ক্লান্তিহরণ বিস্ময় আর অফুরন্ত নীল আনন্দ।

'আমি এখানেই শুলাম, এই সমুদ্রের সকাশে—' মেয়েটি বলছে।

'আশ্রয় চাই, মাথার ওপর ছাউনি, আর নির্জনতা—' পুরুষ বললে।

তারপর আশ্রয়ের অন্বেষণে ওরা বেরুল।

হয়তো পেল আশ্রয়। কোম্পানির কোনো মেজরের সহিসের কাজ।

ঘর পেল। নিরাপত্তা। খাদ্য।

কল্পনা করতে পেরে খুশি হলেন বকশী।

আর কে বলতে পারে ভোরের কল্পনা সত্য হয় না!

বকশী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। আজ সকালে রোড়াং মৌজায় গিয়েছিলেন। খেতে হৈমন্তিক ফসল এবার উপচে উঠেছে। ধান গাছের চারাগুলি সতেজ আর পুষ্ট হয়েছে। যতদূর চোখ চাও আদিগন্ত সবুজ। সবুজের আনন্দ বকশীকে প্রেমিক করেছে। তাঁর প্রেমের দুই শতদল দীপ আর নুরান।

বকশী দরবার ঘরে ঢুকলেন।

তিন

মহারাজার খাস ভৃত্য এসে দণ্ডবৎ জানাল।

'কী ব্যাপার জনার্দন?'

'মহারাজা জরুরি তলব করেছেন।'

'কেন?' বকশীর কপালে চিন্তা ঘনাল। তারপর বললেন, 'আচ্ছা তুই যা। আমি যাচ্ছি।'

বকশী বসে রইলেন কিছুক্ষণ। আজকাল মহারাজের সঙ্গে কচিৎ সাক্ষাৎ হয়! হয়তো ইচ্ছে করেই সরে থাকতে ভালোবাসেন তিনি। কেমন অস্বস্তি লাগে। সুখে-দুঃখে রাজার দীর্ঘ দিনের সাথী। অনেক দেখেছেন অনেক শুনেছেন। এই ঘনিষ্ঠতাই আজকাল বাধো বাধো ঠেকে। মহারাজার সেই শৌর্য বীর্য নেই। গলিতনখদন্ত সিংহে পরিণত হয়েছেন। ইদানীং স্বাস্থ্যও খারাপ হয়েছে। অকাল বার্ধক্য। দুশ্চিন্তা অনিদ্রা তার কারণ। ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী করে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। গোরাদের অনেক কাজকর্ম তার সার্বভৌমত্বকে খর্ব করেছে। মুকুন্দদেব ভাবেননি ওরা এই ভাবে তার পিতৃপিতামহসূত্রেপ্রাপ্ত অধিকারকে নস্যাৎ করে দেবে।

কিন্তু, অসময়ে কেন তিনি ডেকে পাঠালেন, বকশী ভাবলেন। হঠাৎ মনে পড়ল। সামনের হপ্তায় রথযাত্রা। মহারাজ হয়তো পুরী রওনা হবার ব্যাপারে আলোচনা করবেন। প্রতি বৎসর বকশীও যান মহারাজার সঙ্গী হয়ে। প্রজারা রাজদর্শন করে, যে রাজা স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি, যিনি সম্মার্জনী দিয়ে পথের ধুলো স্পর্শ না করলে জগন্নাথের রথ নড়বে না।

আজ এই মুহূর্তে কেন তাঁর রথযাত্রার উৎসবের পুরনো ঘটনা-

গুলিই মনে পড়ছে। 'মনে পড়ছে ভক্ত মানুষের তুমুল কোলাহল, অমানুষিক ভিড়। আর, প্রাণবলি দেয়ার ঘটা। রথের চাকার তলায় নিষ্পেষিত পুণ্যার্থীর উৎসর্গ।

কত, কত লোক আসে। উত্তর প্রদেশের প্রাচীন পথ ধরে ময়ূরভঞ্জ ও নীলগিরি রাজ্যের ভেতর দিয়ে। রাজারা কর আদায় করেন। ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের সীমান্তে ঘুণ্টা ঘাটের কাছে মারাঠা সরকার আদায় করে তীর্থযাত্রী কর। পুরীতে আঠারো নালা সাঁকোর গায়ে তহশিলদারের দপ্তর। তহশিলদার কর আদায় করে আর ছাড়পত্র দেয়। যদিও সরকার একটি অঙ্ক ধার্য করেছিলেন. তহশিলদার আদায় করে বেশি।

এই সকল চিন্তা করতে করতে বকশী চললেন রাজ সন্দর্শনে।

সবচেয়ে গরিব শ্রেণী ওই কাঙ্গালরা। তারা কর দিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটক থাকে। আঁতিপাঁতি করে তাদের অনুসন্ধান করা হয়। এই আঠারো নালা সাঁকোর ধারে তাদের আটকে থাকতে হয় অনুগ্রহের ওপর। আর, হাজার হাজার মানুষের এইভাবে আটকে থাকার পরিণতি কী সাংঘাতিক!

বকশী কল্পনা করতে পারছেন। খাদ্য নেই আশ্রয় নেই। খোলা উন্মুক্ত পরিবেশ। অস্বাস্থ্যকর নোংরা ঝিল, বুনো জঙ্গল। একেক সময়ে ভয়াবহ মহামারী শুরু হয়। তারপর এক সময় কর্তৃপক্ষের দয়ায় তোরণ খোলে আর সেই প্রবেশপথে ঠেলাঠেলি ভিড়ের চাপে দুর্বলেরা যায় মারা।

নিরাসক্তি এবং দূরত্ববোধ থেকে সমস্ত ঘটনাকে বিচার করতে পারছেন জগবন্ধু।

ধর্মের নামে এমন উন্মাদনা, ধর্ম না-কি মৃত্যুর জন্যে—সে সব দিনের স্মৃতি মনে পড়ে। শুধু একবার রথের রশির স্পর্শ চাই। সহস্র সহস্র নরনারীর সামনে তখন একটি মাত্র উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। ধর্মের প্রতিযোগিতায় স্বভাবত দুর্বল পীড়িত হয় সবলের কাছে।

ক্রমাগত কোলাহলের ঘূর্ণি, পেছন থেকে ক্রমাগত চাপ, দাঁড়াবার উপায় নেই, থামবার সাধ্য নেই, হয় এগোতে হবে অথবা গতির বেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে। কে পড়ল মাটিতে, সে শিশু কী বৃদ্ধ, অন্ধ কী চক্ষুষ্মাণ দেখবার ফুরসত কই! যে দেখতে যাবে তারও সেই দশা হবে। যে পড়ে গেছে এবং যে ছুটছে উভয়েরই চোখে এক পুরু অন্ধকার। হয়তো তখন কেউ মানুষ থাকে না, স্থূল চেতনার ঊর্ধ্বে বোধহীন নির্বেদপ্রাপ্তি হয় যাত্রীদের।

লোক. লোক লোক। বৃদ্ধ শিশু খঞ্জ ভিখারী যুবতী বেশ্যা লম্পট গুণ্ডা দালাল। আর সকলের ওপরে বিরাজ করছে মর্ত্যে জগন্নাথের কর্মকর্তারা—পাণ্ডা। ওদের জাতুকরি প্রতিভায় ভিড় পাতলা হয়ে যায়, ভগবানের কাছাকাছি অনায়াসে আসা যায়। মাত্র কয়েক পণ আর গুণ্ডার কপর্দকের বিনিময়ে। অবশ্য এ আদায় সরকারের তরফ থেকে। বকশী হাসলেন: বস্তুত আদায়ের অর্ধেকই গ্রাস করে পাণ্ডা আর মন্দিরের কর্মচারীরা। মুঘল শাসক যেখানে কর আদায় করেছেন নয় লক্ষের মতো, মারাঠাদের শাসনে তাই নেমে দাঁড়াল তুই লক্ষে।

বকশী রাজবাড়ির দেউড়িতে প্রবেশ করলেন।

জগবন্ধুর মনে বিদ্যুতের মতো একটি চিন্তা খেলে গেল। তাঁর একেক সময় নিজেকে মনে হয় পুরাণ-কথিত দেবতার মতো, যিনি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে আস্বাদ করেছেন। বকশী যুগের স্রোতে একেক সময় ভেসে যান, আবার স্রোত ঠেলে উঠে নিজেকে দাঁড়ও করান। তাঁর যুগ তাঁর মধ্যে প্রতিবিম্বিত, তথাপি যুগের সমালোচকও তিনি। এই স্বতবিরোধিতা জগবন্ধুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কখনো মনে হয়, তিনি যেন ভুল করে একটা পুরনো যুগে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁর মন চিন্তা ইত্যাদি দূর কোনো আগামী যুগের।

মহারাজ মুকুন্দদেব খাসকামরায় তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। চিন্তাক্লিষ্ট।

বকশী অভিনন্দন জানালেন।

'বসুন বকশী—' মহারাজ নিশ্বাস ফেলে বললেন।

বকশী আসন্ গ্রহণ করলেন।

'মহারাজ কী অসুস্থ ?'

'না। আমি ভালোই আছি।' মুকুন্দদেব উঠে বসলেন।

নিঃশব্দতা।

বকশী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। আজকাল মহারাজার সকাশে এসে এমন হয়। কোথায় যেন একটা ক্ষোভ বেদনা লাঞ্ছনা কুরে কুরে খায়। বকশী মাথার ওপরে দেয়ালে চামড়ায় ঢাকা লোহার ঢালটা দেখলেন, কাটাকাটি করে রাখা তলোয়ার জোড়া। একটা বাঘের মাথা।

'শুনেছেন বোধ হয় শ্রীক্ষেত্র থেকে পুরোহিত এসেছিলেন। সামনের হপ্তায় রথযাত্রা—' মহারাজ ফাঁসা গলায় বললেন।

বকশী ধীর গলায় বললেন, 'কবে যাত্রা করবেন ঠিক করেছেন ?'

মহারাজার চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল, 'আপনি কী বলছেন বকশী! আমি যাব না।'

'যাবেন না।'

'না।'

'তাহলে রথ চলবে কি করে মহারাজ ? দেবতা—'

মুকুন্দদেব বললেন, 'রথ চলবে না। এবার থেকে চাকা আর ঘুরবে না।'

'কিন্তু—'

'আপনি জানেন ইংরাজ সেখানে কালেক্টার পাঠিয়েছে। জেমস্ হাণ্টার সাহেব। জগন্নাথের সমস্ত পরিচালনার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছে। আমার সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ করবারও প্রয়োজন বোধ করে নি তাঁরা। অথচ আমারই পূর্বপুরুষ এই মন্দির

প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমারই সেবায়েত—'ক্ষোভে কণ্ঠরোধ হয়ে এল মুকুন্দদেবের: 'এর পরও আপনি আশা করেন আমি যোগদান করব?'

বকশী চিন্তিত হলেন। তিনি বিষয়টাকে এইভাবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন নি আগে। ইংরেজ অধিকারের পর প্রথম বছর এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মহারাজার ক্ষুব্ধ হবার ন্যায়সঙ্গত কারণ রয়েছে। হয়তো দেখবেন মন্দিরে গোরা সৈন্য আর পুলিসেরা খবরদারি করছে। তারা রাজাকেও মান্য করবে না। খুরদা রাজ্যের মহারাজা মুকুন্দদেব। দেবদর্শনের সঙ্গে প্রজারা রাজদর্শনেরও পুণ্য অর্জন করে।

মুকুন্দদেব আবার বললেন, 'নীরব থাকবেন না, কথা বলুন। এই বিদেশী বিধর্মীরা দেবোত্তর সম্পত্তির পবিত্র মর্যাদাও রাখতে রাজি নয়। অথচ মুঘল বা মারাঠারা কেউই এমনভাবে আমার মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে নি। এরা ধর্ম বোঝে না, দেবদেবী সম্পর্কে বিশ্বাস নেই, দেবতা ও দেবসম্পত্তিকে তারা স্থূল লাভালাভের হিসাবে বেঁধেছে। মন্দিরের জমিদারির বিপুল আয়ের ওপর ওদের নজর। আবার শুনছি, ওরা তীর্থযাত্রীদের কর তুলে দেবে। উদ্দেশ্যটা কী জানেন?'

বকশীর চোখে জিজ্ঞাসা।

'জনসাধারণের সামনে প্রমাণ করা এই ইংরেজ সরকার কত দয়ালু। মুঘল মারাঠা সরকারের চেয়েও তারা কত সহানুভূতিশীল।' মুকুন্দদেব তিক্ত গলায় বললেন: 'আসল ব্যাপার হচ্ছে ওইসব ঝামেলা পোয়াতে ওদের অনিচ্ছা, তাই উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ। ওদের ধারণা আগের সরকার সকলে মূর্খ, একমাত্র তারাই জ্ঞানের বাতি নিয়ে এসেছে। এই তীর্থযাত্রীর করের অনেক অর্থই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত প্রসাদ পুজো ইত্যাদির খরচ হিসেবে ব্যয় করা হয়। তা ইংরেজ কি মনে করেছে সংবৎসরের এই বিপুল

অর্থ তারা অন্য কোথা থেকে এনে দেবে। দেখবেন আমি বলে রাখছি, ওরা শিগগিরই আবার কর ধার্য করবে।'

বকশী এবার কথা বললেন, 'মহারাজ, গোরারা যাই করুক, দেশের লোক জানে আপনিই রাজা, জগন্নাথের আপনিই একমাত্র সেবায়েত, তাই প্রজারা তো দোষী নয়। তাদের কৃপালাভে বঞ্চিত করবেন কেন?'

মুকুন্দদেব বললেন, 'সে কথা আমিও ভেবেছি। ওদের দোষ কী। কিন্তু, আমি, আমি নিজেকে কী বলে সান্ত্বনা দেবো?'

বকশী বললেন, 'মহারাজ, ভাবুন না কেন স্বয়ং জগন্নাথের তাই অভিপ্রায়।'

মুকুন্দদেব স্থির চোখে জগবন্ধুকে লক্ষ্য করলেন। তারপর বিরস হেসে বললেন, 'বকশীর দেবে এমন ভক্তি আগে তো দেখিনি।'

বকশী হাসলেন। 'মহারাজ, অভক্তিও কি দেখেছেন?'

মুকুন্দদেব বললেন, 'হুম। তাহলে আপনি বলছেন রথযাত্রায় যাওয়া সমীচীন হবে?'

'হবে মহারাজ। বকশী বললেন: 'ইংরেজ ভীষণ সন্দিগ্ধ জাত। ওরা প্রথমেই মানুষকে অবিশ্বাস করে যাতে পরে বিশ্বাসটা পাকা হয়। আপনি যদি না-যান তাহলে ওদের সন্দেহ বদ্ধমূল হবে। ওদের কাছে আপনার না-যাবার অর্থ একটাই, ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ। আপনি ভুলে যাবেন না খুরদার রাজার ওপরে ওরা প্রীত নয়। ইংরেজ আগমনের শুরুতে আপনি কুজাং আর মনিকার রাজাদের সঙ্গে ওদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সে-ঘটনা তারা ভোলেনি।'

মহারাজা মুকুন্দদেব এবার মৌন। কী আশ্চর্য, তাঁর সংশয় দ্বন্দ্বই বকশী কথায় রূপ দিয়েছেন। তিনিও কী এই ধরনের ভাবছিলেন না! ম্লান হেসে বললেন, 'বকশী, আপনি অত্যন্ত বেশি ভাবেন—'

'মহারাজ, দেখেছেন তো দেহের তুলনায় আমার মাথাটা প্রকাণ্ড—'

মুকুন্দদেব হাহা করে হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'ভালো কথা, জনার্দন কোথা থেকে শুনে এসেছে, আপনি নাকি মন্দিরের বিরাট একটা পাথর পিঠ দিয়ে নড়িয়ে দিয়েছেন। সত্যি নাকি?'

বকশী তরল হাস্যে বললেন, 'ওটা বানানো। আমার শক্তি সম্পর্কে জনসাধারণ একটা কিংবদন্তী রচনা করতে চায়।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'ভালো। সত্য হোক মিথ্যা হোক শক্তি সম্পর্কে ওদের এই বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না। বিশ্বাসই আসল মূলধন, তাই না?'

বকশী হাসলেন। 'তবে কবে রওনা হচ্ছেন?'

'পরশু। শুভ দিন।'

বকশী জগবন্ধুর তিনদিন পুরী বাসের স্মৃতি:

সেই পুরনো শহর। মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা বসতি। গঞ্জ, বাজার। অসংখ্য গলিঘুঁজি। পাণ্ডা ছড়িদারদের চটি। গরিব মানুষ। চারদিকে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, রোগ, অনশন, মৃত্যু। জীবনের গতি শ্লথ, জীবন ও মৃত্যু কলরববিহীন। ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। মন্দিরের ছোটো বড় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত মানুষ। সন্ধ্যা হতেই অচ্ছেদ্য অন্ধকার নামে।

বাইরের লোক এখানে রাত্রিবাস করে না। দেবতার স্থানে অনেক বাধা-নিষেধ। নাঃ কোনো কেনাবেচা চলবে না। এক মুঠো চালও সংগ্রহ করা যাবে না। সেদ্ধ চাল নিষিদ্ধ। মহাপ্রসাদের আতপ অন্ন সকলকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ শাস্ত্রের আজ্ঞা

অন্য খাদ্যসম্ভারের দাম আগুন। কটক শহরের চেয়ে দ্বিগুণ

চড়া। যেখানে ছ আনায় একটি মানুষের জীবনধারণ নির্বাহ হয়, এখানে পুরীতে চার আনা খরচ হয়।

আরও কত অসুবিধে। প্রয়োজনে মানুষ কর্জ করতে পারে না। বড় মহাজনের একান্ত অভাব।

এই পুরনো শহর থেকে পুবে সমুদ্রের ধারে গড়ে উঠেছে কালেক-টারের দপ্তর। সিপাহী ব্যারাক, পুলিস ছাউনি। ঝাউগাছে বাতাস খেলে। নীল সমুদ্র দাপাদাপি করে, শালিয়াড়ি স্বপ্ন ভাখে। সাহেবেরা সৈকত ভ্রমণে বেরোয়। সিপাহীরা কুচকাওয়াজ করে। উদ্ধত বেপরোয়া জীবন সিপাহীদের। পুলিসের সঙ্গে কলহ লেগেই আছে। ওরা শাসন মানে না। ওদের বেলেল্লাপনায় স্বয়ং কালেক্টার পর্যন্ত তটস্থ।

কমিশনার কর্নেল হারকোর্ট আর মিস্টার মেলভিল থাকেন কটকে। আর কালেক্টার বসেন পুরীতে।

আমিল আছে। মাসে মাসে খাজনার হিসেব দেয় কালেক্টরকে। কালেক্টার খসড়া হিসেব পাঠান কমিশনারের কাছে।

ট্রেজারী কটকে। পাঁচ ছয় লাখ টাকা জমা হয় ট্রেজারীতে। পুরীতে বসে কালেক্টার আপত্তি করেন এতদূর থেকে তিনি ট্রেজারী পরিচালনা করতে পারেন না।

চারদিকে একটা অসন্তোষ, ক্ষোভ। আর দেশজোড়া শৈথিল্য। গরিব মানুষ সাহেবদের ভৃত্য, মেয়েরা আয়াতে পরিণত হয়েছে। কিছু দেশী যুবকদের পুলিসের চাকরিতে বহাল করা হয়েছে। সহিস, কুলি, ঝাড়ুদার, জমাদারনী। মন্দিরের আওতার বাইরে অবহেলিত মানুষগুলো রোজগারের ধান্ধা পেয়েছে।

সিপাহীদের অনাচারের জীবনযাত্রার বেপরোয়া চেহারাও চোখে পড়ে। রাত্রিতে হানা দেয় মন্দিরের গলিঘুঁজিতে, স্ত্রীসঙ্গবর্জিত জীবনের চাহিদা মেটায় দেশী পানীয় ও নারীমাংসে। ব্যারাকেও ধরে নিয়ে আসে এবং অত্যাচারের মাত্রাধিক্য ঘটলে সমুদ্রসৈকতে

দু-একজন মেয়েমানুষকে মৃত পাওয়া গেলে তার জবাবদিহি করতে হয় না।

অন্ধকার শহরটা ক্রমশ তার আদল বদলাচ্ছে। ছেঁড়া বসনে সে রঙ মাখে, চোখে কাজল টানে, অধরে তাম্বুল, কেশে ফুল। তার দৃষ্টিতে ছেনালী। মনে হয় অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে টেনে হিঁচড়ে বড় করে দেয়া হচ্ছে, অথচ সে সত্যিই মনে বড় হতে পারেনি।

মন্দির, তার গাম্ভীর্য, তার দেবতা, পাণ্ডা, রসুই, আর দেবদাসী নিয়ে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। মন্দির তোরণে খঞ্জ, ভিখারী, কুষ্ঠরোগী মহাপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষায় স্থির নিশ্চল। আরতির ঘণ্টা বাজে, দেবতা প্রসাদ গ্রহণ করেন, শয়ন করেন। দুপুর রাত্রে রাজা আসেন, প্রধান পুরোহিত আসেন, মান্যগণ্যরা নাটমণ্ডপে জমা হন। দেবদাসীর নৃত্যপরা চরণে দেবতার আরাধনা হয়।

আর, ওদিকে গড়ে উঠেছে নাবালক শহর। কোম্পানির নয়া উপনিবেশ। কাছারী, কোয়ারটার্স, ব্যারাক। স্ট্রাণ্ড। ঘোড়ার গাড়ি ছুটছে, পেছনে সহিস। মাঝে মাঝে সমুদ্রের মাঝদরিয়া দিয়ে জাহাজ যেতে দেখা যায়। বিলিতি বাদ্য হাওয়ার সঙ্গে নূপুরের আওয়াজ তোলে।

এই সবই দেখছিলেন বকশী জগবন্ধু। আর চিন্তা করছিলেন।

একদিন পাইক যুবক দীপকে দেখলেন কী! কোম্পানির সাহেবের সহিসের পোশাকে। দীপ তাঁকে চিনতে পারেনি। কারণ বকশী ছদ্মবেশে শহরে ঘুরছিলেন। হয়তো কোথাও সংসার পেতেছে দুজনে। কী নাম মেয়েটির? নুরান। মানুষ কত সামান্য উপকরণে সুখী হতে পারে, বকশী মৃদু হাস্যে ভাবলেন। জীবন বিশ্বাস চায়, প্রীতি চায়, সহানুভূতি চায়।

খুরদায় ফেরার আগের দিন বকশী মহারাজকে অতিশয় ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন দেখলেন। অনেক রাত্রে একা বেরোলেন রাজপুরী থেকে। বকশীকে ডাকেন নি। বকশী লক্ষ্য রেখেছিলেন গুপ্ত দরজা দিয়ে

মহারাজা মন্দিরে প্রবেশ করলেন। কদিন থেকে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালাচ্ছিলেন তিনি। রাজাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আগ্নেয়গিরির মতো তিনি কী তিলে তিলে লাভাস্রোত সঞ্চয় করছিলেন! এক সময় উচ্চনাদে বিদীর্ণ হয়ে পড়ার জন্যে। মহারাজা কী হৃতমন্দিরের ওপর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা উদ্ধার করতে চান!

বকশী চিন্তিত হলেন। মহারাজার জন্যে উদ্বেগ আর শংকা বোধ করলেন তিনি।

চার

আঠারো-শ চার।

জুলাই মাস।

মহারাজা মুকুন্দদেব উত্তেজিত হয়ে দরবারকক্ষে পদচারণা করছেন। তাঁর সারামুখে প্রতিজ্ঞার আগুন, প্রতি পদক্ষেপে দৃঢ়তা। আহত সিংহ কেশর ফুলিয়ে জেগে উঠেছে বুঝি!

পুরী থেকে ফিরে তিনি অন্যমানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। অন্দরমহলে যাবার ফুরসত নেই। নির্জনে তাঁর চিন্তা লালন করছেন। নাঃ, বকশীকেও তিনি ডেকে পাঠান নি। বকশীর শীতল যুক্তি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে কমজোর করে দেবে। দেশের লোক দেখুক, মুকুন্দদেব মরেন নি। সিংহের বাচ্চা মেষশাবক হয় না। সম্প্রতি জগন্নাথধাম থেকে ফিরে মহারাজার মনে হয়েছে তিনি প্রতিমুহূর্তে ধিক্কৃত হচ্ছেন, উপহসিত হচ্ছেন। গোরারা তাঁর মন্দিরের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। যে-মন্দির গড়েছে তাঁরই পূর্ব-পুরুষ। প্রধান পুরোহিত পর্যন্ত মহারাজার দলে। বিদেশী বিধর্মীর দেবালয়ের ওপর হস্তক্ষেপ তিনি মেনে নেন নি। মহা-রাজাই সেবায়েত, স্বয়ং দেবতার প্রতিনিধি।

মুকুন্দদেব খবর নিয়েছেন, কটকে গোরা সেনাবাহিনী ভেঙে দেয়া হয়েছে। মাদ্রাজ রেজিমেণ্ট ফিরে যাচ্ছে মসলিপত্তমে। দেশী সিপাহীরা ছড়িয়ে পড়েছে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায়। ইংরেজ এখন দুর্বল। যে-কোনো মুহূর্তে সৈন্য সমাবেশ করতে পারবে না।

মহারাজ অবশ্যই ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে ওরা তাঁকে তাঁর পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অধিকারগুলি থেকে

বঞ্চিত করবার অধিকার পেয়েছে। মারাঠা-সরকার তাঁর সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করেনি। মিত্রতা হয় সমানে সমানে। সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যায়। কিন্তু, ইংরেজরা তাঁর সম্মান দেয়নি। এমন কি তাঁর মহারাজত্ব নিয়ে তারা ব্যঙ্গ করেছে। ওদের কাছে তিনি মোকদম মাত্র, খাজনা আদায়ের সরকারী কর্মচারী! তাঁর জমি, তাঁর জায়গীর সেখানে তিনি রাজা নন, রাজা হবে ইংরেজরা, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে। আস্‌ল ওই বেনিয়ারা!

এদিকে রাজকোষের অর্থ নিঃশেষিত। রাজনীতিক অব্যবস্থায় খাজনা আদায়পত্তর নষ্ট হয়েছে। প্রজারা অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর হাত গুটিয়ে বসে আছে। এই অবস্থা চললে দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হবে। রাজা হিসেবে রাজ্যের কল্যাণ তাঁকে দেখতে হবে বইকি।

কিন্তু এখনো তাঁর লোক ফিরে আসছে না কেন।

মহারাজা উত্তেজিত পদচারণা শুরু করলেন।

কোন্ সকালে পাঠিয়েছেন নবকিশোরকে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্যে। এখনো তার ফেরার নাম নেই।

মুকুন্দদেব শংকিত হলেন। আজকাল সব কিছুতেই তিনি শংকা বোধ করেন। কেন যেন মনে হয় স্বাভাবিকভাবে সবকিছু হবার সময় আর নেই। প্রতিটি পল, প্রতিটি মুহূর্ত শুধু আতংকে কাঁটা হয়ে ওঠে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল।

মহারাজা অস্বস্তিতে স্নানাহার করলেন।

ক্লান্তশ্রান্ত নবকিশোর ফিরে এল পড়ন্ত দুপুরে।

'সংবাদ শুভ সব? আদায়-উশুল হয়েছে?' মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন।

নবকিশোর ম্লান হয়ে বললে, 'আদায় হয়নি মহারাজ—'

'কেন? আমার প্রজারা এত অশিষ্ট উদ্ধত হয়ে উঠল কেন?'

'প্রজাদের দোষ নেই মহারাজ'—নীচু গলায় বললে নবকিশোর।

'তবে? তুমি কিছু বলছ না কেন, সমস্ত বিষয় আমাকে স্পষ্ট করে বলো—'

'বলছি মহারাজ। অপরাধ নেবেন না। প্রজাদের ওপর নির্দেশ জারি করা হয়েছে—এখন থেকে খাজনা আদায় করবে সরকারের আমিন।'

'এর অর্থ?' রাজা গর্জে উঠলেন।

'ওই সমস্ত জমি সরকারের খাস। নাকি মারাঠাদের বরাবর স্বত্ব ইংরেজদের ওপর বর্তেছে।'

'এতদূর স্পর্ধা ফিরিঙ্গি বেনেদের! আচ্ছা তুমি যাও, বিশ্রাম করো গে।'

নবকিশোর অভিবাদন করে বিদায় নিল।

সারা রাত্রি বিনিদ্র যন্ত্রণায় কাটল মহারাজার।

আহত সাপের ল্যাজে আঘাত পড়লে যেমন আক্রোশে ফুঁসে ওঠে তেমনি একটা ক্রোধ তাঁকে দাহ করতে লাগল। মস্তিষ্কে সুতীব্র জ্বালা বোধ করতে লাগলেন। জ্বর জ্বর প্রদাহ। মুকুন্দ-দেবের চোখের সামনে তাঁর কৈশোর যৌবন আর একবার পরদার মতো কম্পিত হয়ে উঠল। অকস্মাৎ কৈশোর-বেদনা তাঁকে গ্রাস করল। নিজেকে মনে হল মাতৃহীন কিশোর। ভয় নয়, দুর্বলতা নয়, দামাল উত্তেজনা তিরতির করে কাঁপতে লাগল শোণিতে। দেখা শোনা পিতৃপুরুষের শৌর্যবীর্যের সমূহ প্রতিমূর্তি তিনি এক সঙ্গে দেখতে পেলেন। দেয়ালে টাঙানো আছে বীরকেশরীদের প্রতিকৃতি।

গোরাদের স্পর্ধার সীমায় তিনি অবর্ণনীয় ক্ষোভ ও রিক্ততা বোধ করলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাঁর মানসিকতা সরল ছন্দে গ্রথিত। এই উত্তেজনা তাঁর স্বভাববিরোধী।

জনার্দনকে পুরীতে পাঠিয়ে মুকুন্দদেব দিন গুনতে লাগলেন।

উধর্বশ্বাস দিনগুলি খরার দিনের আগুনের মতো ছুটোছুটি করতে

লাগল। পাইক পল্লীতে নিত্য বৈঠক বসছে। খণ্ডপতি প্রধান বক্তা, তার পদাতিক বাহিনীকে সে প্রস্তুত করে তুলছে। আর সান্ধ্য আসরে খণ্ডপতির মহারাজার সঙ্গে সলা-পরামর্শ। আশ্চর্য, মহারাজা একবারও ডাকলেন না বকশীকে। বকশী অবশ্য শয্যাশায়ী আছেন। তাঁর পুরনো রোগ। প্রতি বছর ত্বকে প্রদাহ দেখা দেয়, চামড়া খসে খসে পড়ে, জ্বালা। চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। শয্যায় শুয়ে কিছু কিছু ঘটনা বকশীর কানে পৌঁছচ্ছিল বইকি। সুস্থ থাকলে কি হত বলা যায় না। ব্যাধির যন্ত্রণায় বকশী অন্যদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি।

দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আসে সৈন্যসামন্ত নিয়ে।

তিনচার দিন পর মহারাজার খাস ভৃত্য জনার্দন ফিরে এল। মাস্তুলভাঙা পালছেঁড়া জাহাজের মতো। ধূলিধূসর। মলিনকান্তি, শীর্ণ, বুভুক্ষু।

মহারাজা চমকে উঠলেন ওকে দেখে।

'মহারাজ, আমি ধরা পড়ে গেছি—' জনার্দন ধুঁকতে ধুঁকতে বললে।

মুকুন্দদেব যেন বুঝতে পারলেন না ওর কথার অর্থ। ধরা পড়ে গেছি বলতে কী বোঝাতে চাইছে সে!

জনার্দন দম নিয়ে সমস্ত ঘটনা বলল। খুরদা থেকে বেরুনো মাত্র গোরা-চর তাকে অনুসরণ করছিল। তারপর পিপলির কাছাকাছি পৌঁছতে কোথা থেকে জনা চারেক লোক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। অত্যাচার, জুলুম। শেষপর্যন্ত ওরা মহারাজের গোপন পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে।

ভয়ংকর সর্বনাশের সামনে পড়লে মানুষকে কেমন দেখায়! মহারাজা প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন। কিন্তু যে ভাগ্য তাঁর নিজের হাতে-গড়া তার বাইরে তিনি যাবেন কী করে। এরপর কী ঘটবে পর-পর

ভেবে যেতে পারছেন। ভবিষ্যতকেও তিনি দিব্যচক্ষে পাঠ করতে পারছেন।

সেপ্টেম্বর মাস।

কমিশনারের আদেশ জারি হল: 'অতঃপর মহারাজা সরকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া সরকারি এলাকার কোনো প্রজার ওপর কোনোরকম হুকুম প্রদান করতে পারবেন না।'

অক্টোবর মাস।

রাত্রির অন্ধকারে যাত্রা করল মহারাজার সেনাবাহিনী। খণ্ডপতি। মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে ঢাল-তলোয়ার। পেছনে অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনী। রণক্ষুধায় মেতে উঠেছে পাইক। সারা গায়ে হরিদ্রামৃত্তিকা, মুখমণ্ডল সিঁদুরে রঞ্জিত, হাতে গাদা বন্দুক। রক্তপায়ী শ্বাপদের মতো ভয়ংকর।

ভিজে অন্ধকারে পিপলির তন্দ্রাতুর আকাশ রণ হুংকারে আর্তনাদ করে উঠল। মুহুর্মুহু বন্দুকের আওয়াজ, অশ্বখুরের শব্দ, রণবাদ্য আর ভয়ার্ত পলাতক গৃহস্থের চিৎকারে দিগন্ত বধির হয়ে উঠল। গৃহপালিত জন্তু, গৃহে হাতের নাগালে যা সামগ্রী পেল মহারাজার সৈন্যেরা লুটপাট করে নিল।

জয়লাভে মত্ত রাজবাহিনী অভিযান সেরে প্রত্যাবর্তন করল।

মহারাজার গুপ্তচর ইংরেজের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্যে সতর্ক হয়ে রইল।

খবর এল কমিশনার গঞ্জাম থেকে সৈন্য আমদানীর আদেশ দিয়েছেন। এবং একটি রেজিমেণ্ট কটক থেকে রওনা হয়ে গেছে। কমিশনার আরও নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় জমিদাররা যদি ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তাহলে তাদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে হবে। সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের ভার স্থানীয় অধিবাসীদের নিতে হবে।

অপ্রতিহতগতিতে ইংরেজ সৈন্য হাজির হল পিপলিতে।

মহারাজার সৈন্য বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ইংরেজের আধুনিক অস্ত্রের সামনে তারা দাঁড়াতে পারল না।

মহারাজা বললেন, 'সম্মুখ যুদ্ধে আমরা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না। সৈন্যদের পিছন ফিরতে বলো।'

সৈন্যদের সঙ্গে মহারাজা আশ্রয় নিলেন দুর্গে। খুরদার পশ্চিম পারে পাহাড়ের নীচে এই দুর্গ। দুর্ভেদ্য প্রবেশপথ পাহাড়ের ক্ষীণ পথ দিয়ে। দুধারে বারোনি পর্বতশ্রেণী। পাথরে-গাঁথা শক্ত ইমারত।

ইংরেজ সৈন্য দুর্গ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল।

দুর্গ থেকে মাঝে মাঝে বন্দুকের গুলি, বৃষ্টির মতো শর।

ইংরেজ প্রত্যুত্তর দেয়।

একুশ দিন পর ইংরেজের কামানের প্রচণ্ড আক্রমণে দুর্গ ভেঙে পড়ল।

মহারাজার সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিল। অনেকে পালাল জঙ্গলের দিকে।

মহারাজা মুকুন্দদেবকে ওরা ধরতে পারল না।

মুষ্টিমেয় অনুগামী নিয়ে মহারাজা আত্মগোপন করলেন পাহাড়ের গভীরে। সোজা দক্ষিণ দিকে।

ইংরেজ সৈন্য ক্লান্ত, অবসিত, তারা আর মহারাজার অনুসরণ করল না।

মাত্র কয়েকদিন আত্মনির্বাসনের নির্মম যন্ত্রণা ক্ষোভ ক্ষুধা আর আতংক ভোগ করে মুকুন্দদেব বেরিয়ে এলেন আত্মসমর্পণ করতে।

সরকার তাঁকে সপরিবারে বন্দী করে রাখলেন কটক দুর্গে। মহারাজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল।

একদিন খুরদার মানুষেরা দেখল রাজ্যের পরিচালনার ভার

নিয়ে এলেন মেজর ফ্রিচার। রাজ্যে প্রথম গড়ে উঠল সরকারি ভবন।

মহারাজার বিদ্রোহী আত্মা যাতে আর কোনোদিন মাথা চাড়া দিতে না-পারে মেজর সাহেবের নীতি হল নানকর খাজনা-মকুব পাইকদের জমির অধিকার কেড়ে-নেয়া।

পাইকরা জীবনে প্রথম শুনল ঃ জমানা বদল। জমির জন্যে তাদের নির্দিষ্ট খাজনা দিতে হবে।

ইতিহাস সেদিন ব্যঙ্গের হাসি হেসেছে।

পাঁচ

উনিশ শতকের প্রত্যুষে দলে দলে ভাগ্যান্বেষী বাঙালী সরকারী চাকরির লোভে দীর্ঘপথ পাড়ি দিল। বিশেষ করে হুগলি থেকে বহু বাঙালী সপরিবার কটক বালেশ্বর পুরীতে গিয়ে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করল।

এরা ফারসি জানে, ইংরেজি শিখেছে, মাতৃভাষা তো আছেই। সরকারি দপ্তর এদের জন্যে উন্মুক্ত। কেউ দেওয়ান, কেউ গোমস্তা, তহশিলদার, বাঙালী আমিনে ছেয়ে গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়াবহ রকমের নিরক্ষর। দু-একজন কাজ-চলা গোছের ফারসি অবশ্য জানে। লেখে লোহার কলমে তালপাতার ওপর। সাধারণ কলমে কাগজে লিখতে দিলে কাগজ ছেঁড়ে কলম ভাঙে। কায়ক্লেশে মুহুরির চাকরি জোটে।

ইংরেজ এদেশের ভাষা বোঝে না। বাঙালী আমলা গোষ্ঠী উন্নাসিক। ফলে জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ ঘটে না। সব ব্যাপারে সরকারকে আমলাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমলারা তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। কোনো কাজের জন্যে কারুর কাছে জবাবদিহি করবার বালাই নেই। ওরা রাতারাতি খুদে নবাবে পরিণত হয়। আর, নবাবীর জন্যে সেলামির ব্যবস্থা আছেই। দপ্তরখানা ঘুষ, জালিয়াতি, ফাটকাবাজিতে ছেয়ে গেল। নথিপত্রের জন্যে জমিদারকে যেতে হয়। কে না জানে টাকায় টাকা বাঁধে। দরখাস্তের নকল চাও? টাকা। সেটেলমেণ্টের দলিল কী মকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র পেতে হলে টাকা। দিনকে রাত করারও উপায় আছে। আসল দলিল সরিয়ে ফেলে জাল

দলিল। নাজির, বকশী পদে পদে জমিদারের অন্যায় খুঁজে পায়, আর টাকা দিলেই অন্যায়ের সংশোধন হয়। ধরা পড়লে দাও দপ্তর পুড়িয়ে, লোক লাগিয়ে ডাকাতি করিয়ে দাও। দুর্ঘটনার ওপর মানুষের হাত নেই।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ এলেন কলকাতা থেকে। কালেক্টারের দেওয়ান। খ্যাতি প্রতিপত্তি। অর্থ। সকালে দপ্তরে আসেন পালকি করে, দুপুরে আহারাদি সেরে বিশ্রাম, বিকেলে কাজ থাকলে দপ্তরে আসেন।

কিছুদিন এদেশে পা দিয়েই মানুষগুলোর নাড়ীনক্ষত্র বুঝে ফেলেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। নির্বোধ জন্তুর মতো ভীত, শ্রান্ত। মুখে রাগ নেই, কথা কম বলে। অবিশ্বাস হয়তো আছে। চামড়ার রঙ এক হলে কি হবে ওরা বাঙালীদের সন্দেহ করে। বস্তুত বিদেশী মাত্রই ওদের সংশয়ের বস্তু।

কৃষ্ণচন্দ্র সময় পেলেই শহর-প্রদক্ষিণ করতে বেরোন। সুদূর বাঙলা থেকে এ প্রদেশ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শোনা ছিল। বালেশ্বর, ধামরাহ, চূড়ামন বন্দর। জাহাজ আসে। কড়ি, নারকেল, প্রবাল, শুকনো মাছ নিয়ে, আর এখান থেকে বহন করে নিয়ে যায় চাল আর মাটির বাসনপত্র। কলকাতা বন্দরে পৌঁছোয় এদেশের চাল।

বালেশ্বর থেকে চাল আজও যায় বটে, আর সামান্য লবণ।

আসলে একমাত্র চালই এদেশের রপ্তানী দ্রব্য।

কৃষ্ণচন্দ্র এই শহরে পৌঁছে দেখলেন চালের সংকট এখানে লেগেই আছে। চালের বাজার দণ্ডীদার আর ব্যাপারীদের হাতে। চালের দাম তেজী রাখতে তারা আমদানী নিয়ন্ত্রণ করে। বর্ষাকালে অথবা অনাবৃষ্টির কালে বাজারে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে।

সিপাহীরা বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট। উপযুক্ত খাদ্যের জন্যে তারা দরবার

করে। শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হতে বসে। কোনোদিন দাঙ্গা বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়।

শুধু সিপাহী কেন, সাধারণ শহরবাসীদেরও একই দুর্ভোগ।

চতুর বিচক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রের বুঝতে অসুবিধে হয়নি এ-সংকটের সবটাই বানানো। মহানদী পেরিয়ে মাত্র কুড়িমাইল উত্তরে কোনো খাদ্যাভাব নেই। বালেশ্বরে তিনবছরের চাল জমা, ধামরাহ-চূড়ামনিতে গুদামজাত চাল মাদ্রাজে চালানের জন্যে প্রহর গুনছে।

কটকে প্রচুর মারাঠাদের বাস। স্বভাবত ইংরেজদের ওপর ওরা ক্রুদ্ধ। তাই তারা ষড়যন্ত্র করছে যাতে বাইরে থেকে শহরে চাল না আসে। উদ্দেশ্য খাদ্যাভাবের গুঁতোয় সরকারকে দেশছাড়া করা। এই সব ব্যাপারীরা সম্বলপুর থেকে চাল আনত, তা বন্ধ হয়েছে। রায়তদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা, অগ্রিম দিয়ে তাদের মাথার চুল পর্যন্ত বাঁধা।

রায়ত শক্তের ভক্ত। জোর না-করলে তারা ধান বার করে না। মারাঠারা তাদের এই প্রকৃতি জানত। রায়ত মারাঠাদের অত্যাচারের ভয়ে বশ মেনেছে। এ কেমন গোরা সরকার! তারা জোর করে না। জবরদস্তি করে না। আবার বলে ধান দাও টাকা পাবে। মারাঠা সরকারের জুলুমের পর ইংরেজের এই শিষ্টাচারকে ওরা দুর্বলতা বলে মনে করল। তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবল : তারা স্বাধীন। এবং কারুর কাছে তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

আমীনরাও সরকারের বিরুদ্ধে হাত লাগিয়েছে। কারণ মাদ্রাজে চাল রপ্তানী করলে ব্যাপারীদের মুনাফা বেশি, আর সেই সঙ্গে তাদের ভাগেও মোটা অঙ্ক জমা হয়। কটকে পাঠালে তো লাভ হবে না।

পর পর তিনবছর খাদ্য সংকটের সমস্যায় শেষ পর্যন্ত কালেক্টার ঠিক করলেন চাল কেনা ও গুদামজাত করার জন্যে অগ্রিম দশহাজার টাকা দেবেন। সিপাহীদের জন্যে অথবা ক্যাণ্টনমেণ্ট বাজারে চাল

সংগৃহীত হবে। চাল রাখার জন্যে গুদাম তৈরি হল, চাঁদনি চকে সাধারণের বাজার খোলা হল। খুচরো দোকানীদের উৎসাহিত করবার জন্যে বিনা মূল্যে জমি দেয়া হলে সারি সারি কাঁচা ঘর নির্মিত হল।

তাঁর চোখের সামনে এই সমস্ত পরিবর্তন ঘটতে দেখলেন কৃষ্ণচন্দ্র। এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে তাঁর মনের আদলও বদলাল। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র ; চোখে স্বপ্নের মূর্তিও ছিল বিরাট। আর দশজন চাকুরীজীবীর মতো দিনগত পাপক্ষয় করে জীবন কাটিয়ে দিতে তিনি চাননি। দেওয়ানের পদে যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তি ও অর্থ তাঁর জুটেছে। সিন্দুকে সম্পদ উপচে উঠছে। জীবন যাত্রার ব্যয় কম। বেতনের টাকায় হাত পড়ে না। দপ্তরের বেয়ারা তু-চারজন বিনা বেতনে কাজ করে দেয়। তুবেলা তুমুঠো খাচ্ছে তারা সন্তুষ্ট। ভারে করে জল এনে দেয়, বাড়িঘর পরিষ্কার করে, বাগানে খাটে। গোয়ালা তুধ দিয়ে যায়, মেছো মাছ, শবজি আসে। প্রায়ই কিনতে হয় না। আশেপাশের জমিদারদের কাছ থেকে এসব উপঢৌকন আসে।

বাড়ি হয়, বাগান হয়। আর বনেদী রক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের শিরায়, একান্নবর্তী সংসারের মধ্যমণি হয়ে থাকতে ভালোবাসেন। স্ত্রী ছেলেপিলে তো আছেই। ভাই গৌরহরিকে লিখেছেন এখানে চলে আসতে। পুজোপার্বণ উৎসব লেগে আছে। ধুমধাম করে তুর্গাপূজা করেন। কুমোরটুলি থেকে শিল্পী আসে। বাদ্যি বাজে। আর, প্রচুর লোককে খাওয়ান।

এক নামে বাবু কৃষ্ণচন্দ্রকে সকলে চেনে। সাহেব সুবোরাও খাতির করে। স্বয়ং কালেক্টার গ্রোয়েম সাহেব অষ্টপ্রহর তাঁকে ডাকছেন : 'বাবু—বাবু—' সাহেব কাজ বোঝেন, কাজের লোককে চিনতে তাঁর দেরি হয় না। দেওয়ানের ওপর বিশ্বাস করা তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

তবু, চাকরি করতে তাঁর ভালো লাগে না। হাজার হোক স্বাধীন তো নন। চাকরি করেই যদি কাটাবেন তবে দেশ ছাড়লেন কেন? নিজের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে এই দেশে এসে আবাস গড়বেন কেন! স্বদেশ ছেড়ে আসার পর কই তার জন্যে তো কোনো টান বোধ করেন না তিনি। বরং এই দেশটাকে যত দেখছেন ভালো লাগছে। ভালো লাগছে মুহুর্মুহু এর পরিবর্তনের রূপ। পুরাতন আর নবীনের সন্ধি। নতুন করে সব গড়ে উঠছে। তার মানে কামারের চাকার মতো তাল তাল মাটি, উদ্ভিদ, গাছগাছালি, মানুষ, সব, সবকিছু নতুন ধরনের বিকশিত হয়ে উঠছে।

আর, সবচেয়ে নেশা লাগে শহর ছাড়িয়ে বেড়াতে বেড়াতে কোনোদিন দেহাতের দিকে চলে এলে। আদিগন্ত সবুজ, পুষ্ট ধানের গোছ হাওয়ায় তরঙ্গ তোলে। রোগা হ্যাংলা বিধবা কন্যার মতো নয়, স্বাস্থ্যবতী পীনোদ্ধত সবলজঙ্ঘা এদেশের কালো-কঠিন রমণীর মতো।

এই ধান-বোনা মাঠের গন্ধে চেতনা সাপের ফণার মতো দুলতে থাকে। নাকি সবুজ সিদ্ধির নেশা। অনেকক্ষণ ধানকানা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কৃষ্ণচন্দ্র। জমি, জমি, জমি। এ দেশের মানুষ চিরকালই এই জমির সঙ্গে কলুর বলদের মতো ঘুরবে।

সেরেস্তাখানায় এতদিনের দেওয়ানীতে নথিপত্রে কেবল জমির ফিরিস্তি দেখেছেন তিনি। জমি খরিদ, হস্তান্তর, সমস্ত বয়ান তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে। "আমি, রঘুনাথ মহান্তি, অমুক মৌজা অমুক পরগনার ভুঁইঞা, শংকর পটনায়কের পক্ষে নিম্নলিখিত বিক্রির কবলা করিতেছি। অদ্য আপনার নিকট হইতে কড়িতে ৩৫ তঙ্কা বুঝিয়া পাইয়া লিখিয়া দিতেছি। যতদিন চন্দ্র সূর্য ধরণীর অস্তিত্ব থাকিবে আপনি উক্ত জমি ভোগ করিবেন। অন্য কোনো হকদার, প্রতিবাসী, কিংবা আমার উত্তরাধিকারীরা কখনো দাবি উপস্থিত করিলে আমি জিম্মাদার রহিলাম। জন্মজন্মান্তর আপনি ইহার অধিকারী রহিলেন।

মাটির উপরে, মাটির গর্ভে, জল, ডাঙা জমি, খনিজ সম্পদ, পুষ্করিণী. কূপ, বৃক্ষ, প্রান্তর, যাবতীয়, আপনি বৃক্ষ ছেদন এবং রোপনে সম্পূর্ণ স্বাধীন—”

কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীনভাবে হাসলেন। কাতারে কাতারে মানুষ কালেক্টারিতে এসে প্রতিদিন জমা হচ্ছে। যতটুকু জমিই হোক তাকে পাকা করা চাই! জমিদার চাষী সকলেই জমির কাছে বাঁধা। মাটির কাছাকাছি থেকে একমাত্র গাঁয়ের মানুষেরা মাটিকেই সার জেনেছে। বিচিত্র জমিদারেরা! এরা কোনো দিন জমি দেখেছে কিনা সন্দেহ। নতুন রাজার অধীনে তাদেরই ভয় বেশি। জমির সঙ্গে সম্পর্ক আল্‌গা বলেই বোধ হয়। চোখের সামনেই দেখলেন কৃষ্ণচন্দ্র জমিদার কৃষক বস্তুত কারুরই জমির ওপর স্থায়ী স্বত্ব নেই। শুধু বিশ্বাস, প্রচলিত প্রথা আর ক্ষমতার ওপর সব চলেছে। জাল ফাজিল দলিলে ছেয়ে গেছে। আর উৎকোচ প্রলোভন নয়কে হয় করছে।

কৃষ্ণচন্দ্র এর উর্ধ্বে নন। তিনি দর্শক। তবে এটা বুঝতে পারছেন জমির ওপর চাপ বাড়ছে। চারদিক থেকে সব ব্যবসায়ে ফতুর হয়ে একমাত্র জমিই হচ্ছে লক্ষ্মী। এ অবস্থা বেশিদিন চলবে না।

সেদিন অপরাহ্নে গম্ভীর এবং চিন্তাক্লিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র দপ্তর থেকে বাড়িতে ফিরলেন। স্ত্রী মানদাসুন্দরী স্বামীর মুখ দেখে বললেন, ‘কর্তার কি শরীর অসুস্থ?’

‘না।’ কৃষ্ণচন্দ্র হাত বাড়িয়ে শ্বেতপাথরের শরবতের গ্লাস হাতে টেনে নিলেন।

মানদাসুন্দরী বললেন, ‘তুমি যে আজকাল কী ভাবো বুঝতে পারি নে। অত কী ভাবনার আছে?’

‘ভাবছি এবার চাকরি ছেড়ে দেবো।’

‘কেন? কী হয়েছে?’

কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন। ‘অনেক দিন তো হল—’

'কী করবে তাহলে? . দেশে ফিরে যাবে?'

'না। এখানেই বাস করব।' কৃষ্ণচন্দ্র একটু চিন্তা করে বললেন, 'কী জানো গিন্নি, দেওয়ানির কাজে আর সে গৌরব নেই। কমিশনারের দপ্তর তুলে দেয়া হচ্ছে। এখন থেকে রাজস্বের ব্যাপার কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বোর্ড অব রেভিন্যু সরাসরি তদারক করবে।'

'ও তাই বলো' মানদাসুন্দরী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন: 'কেন কালেক্টার সাহেব থাকবেন না?'

'গ্রোয়েম সাহেবও চলে যাচ্ছেন। নতুন কালেক্টার আসছেন ওয়েব সাহেব।'

'তাতে তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে?'

'না। আর দাসত্ব ভালো লাগে না। এবার স্বাধীন হয়ে দেখি।'

'যা ভালো বোঝো করো।' মানদাসুন্দরী মুখ গোঁজ করে চলে গেলেন।

'শুনছ? গৌরহরি বোধহয় কালকেই এসে পড়বে। ওর জন্যে তহশিলদারের চাকরি ঠিক করে রেখেছি।' গৃহিণী চলে গেছেন জেনেও স্বগত উচ্চারণ করলেন কৃষ্ণচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাট সংসার। সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপর। কাজেই সমস্ত কিছু চিন্তা না-করে তিনি কাজ করেন না। বাড়ি হয়েছে, পুকুর, বাগান। কয়েকটা মহলও কিনেছেন তিনি। আরো কিছু মহল খরিদ করার অভিলাষ।

বাইরে দেউড়িতে একটা পালকি এসে দাঁড়াল।

পশ্চিমাকাশে বেলাশেষের সূর্য লোহিত হয়ে উঠেছে। শ্রান্ত-পায়ে সন্ধ্যা নামছে। তালগাছের মাথায় বাবুই পাখিদের বাসা। পাখিরা নীড়বাসী হচ্ছে।

ভৃত্য এসে খবর দিল। খুরদা থেকে বকশী এসেছেন।

বকশী! বকশী জগবন্ধু! অকারণে চমকালেন কৃষ্ণচন্দ্র। এর

আগেও কয়েকবার দেখা হয়েছে মানুষটার সঙ্গে দপ্তরে। বেঁটে অথচ পাথরের মতো শক্ত শরীর। মুখখানা বিশাল। কম কথা বলেন। আর চিন্তা করেন বেশি। ওঁর মুখোমুখি বসতে দুর্ধর্ষ দেওয়ান কৃষ্ণ-চন্দ্রেরও কেমন অস্বস্তি লাগে। বোধকরি একটা গোপন ঈর্ষাও আছে কৃষ্ণচন্দ্রের। এই·মানুষটা মাঝসমুদ্রের মতো স্থির, অচঞ্চল। অথচ মৃত্যুর মতো, নিয়তির মতো দুর্লঙ্ঘ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র বৈঠকখানা খুলে দিতে আদেশ করলেন।

বকশী বসেছিলেন ফরাশে। কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'নমস্কার দেওয়ানজী।'

'নমস্কার বকশী। বসুন বসুন।'

বকশী বসলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন ওঁর দিকে। গৈরিক বসন। মাথায় শিরস্ত্রাণ। ললাটে দীর্ঘ সিন্দুররেখা। কটিদেশে তলোয়ার।

'তারপর, কি খবর বলুন—' কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন: 'অনেক দিন পরে দেখা।'

বকশীও হাসলেন। 'দীর্ঘকাল বটে। কী জানেন দেওয়ানজী, রাজপুরুষদের সঙ্গে সন্দর্শন যত কম হয়—'

কৃষ্ণচন্দ্র অট্টহাস্য করলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'ভয় নেই বকশী। আমি শিগ্রিই দেওয়ানি ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ফিরে যাবেন দেশে?'

'না। এখানেই থাকব।'

'ও।' বকশী থামলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'তারপর এসময় হঠাৎ—?'

বকশী বললেন, 'কমিশনারের দপ্তরে একটু দরকার ছিল। কাজ শেষ হতে দেরি হল। ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'বেশ করেছেন।' কৃষ্ণচন্দ্র করতালি দিয়ে ভৃত্যকে জলযোগের ফরমাস করলেন।

বকশী বললেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। জানেন তো আমি একাহারী।'

'তবু অতিথি নারায়ণ। শুধু মুখে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ।'

'আপনার সঙ্গে পারবার যো নেই। কেবল একটু শরবতের ব্যবস্থা করুন।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'মহারাজ মুকুন্দদেবের সঙ্গে দেখা করলেন নাকি? তিনি তো ফোর্টেই বন্দী আছেন। সপরিবারে বহাল তবিয়তেই আছেন শুনছি।'

বকশী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ। না, দেখা করার প্রয়োজন হয়নি।'

'আপনি তো শুনলাম খুরদায় অনেকদিন ছিলেন না?'

'একটু তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলাম। সম্প্রতি ফিরেছি।'

'তীর্থে পুণ্য অর্জন করা যায়, তাই না?'

বকশী হাসেন। 'শাস্ত্র তো তাই বলে।' একটু থেমে: 'কই, আমার ওখানে তো একবার পায়ের ধুলো দিলেন না?'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'যাব, এবার নিশ্চয়ই যাব। শিগ্রিই তো মুক্ত-পুরুষ হচ্ছি।'

'যাবেন।'

বকশী ভৃত্য-পরিবাহিত শরবত গ্রহণ করলেন।

'যাই বলেন'—কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন: 'মুকুন্দদেব বুদ্ধিমানের পরিচয় দেন নি।'

বকশী গম্ভীর হলেন। বললেন, 'মহারাজার সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই, দেওয়ানজী। অনেক নুন খেয়েছি।'

'ভেবে দেখুন এই ইংরেজরা কত শক্তিশালী।' কৃষ্ণচন্দ্র আবার বললেন: 'বাহুবলের শক্তি নয়, মনের শক্তি। আমরা বড় ছোট হয়ে পড়েছিলাম, তাই ওদের বড়ত্বের কাছে আমরা সহজেই বাঁধা পড়লাম।'

বকশী হেসে বললেন, 'আপনারা বাঙালীরাই প্রথম ওদের

উদারতা বুঝতে পেরেছিলেন। বড় দীঘিতেই বড় প্রতিবিম্ব পড়ে, দেওয়ানজী।'

কৃষ্ণচন্দ্র সন্দেহের চোখে বকশীর দিকে তাকালেন। শরবত সেবনের জন্যে অথবা অন্য কোনো কারণে বকশীর মুখ গৌর দেখাচ্ছিল।

'তাই বলছিলাম ইংরেজদের বিরোধিতায় আমাদের উন্নতি নেই। ওদের বিজ্ঞান, ওদের দর্শন আমাদের গ্রহণ করতে হবে।'

'আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করছেন দেওয়ানজী?'

'না, পরীক্ষা নয় বকশী। ইংরেজদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তাদের চেনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দেখেছি ওদের সমস্ত আচরণে একটা নীতি আছে, নিয়মের বাইরে ওরা এক পাও এগোয় না। ভেবে দেখুন গোটা ভারতবর্ষের কী চেহারা ছিল; অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা আর শৈথিল্য। ইংরেজ তামাম দেশটাকে একটা ঐক্যের বন্ধনে বেঁধেছে। সারা দেশের একটা চরিত্র ক্রমশ আকার নিচ্ছে।'

'আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার কম, দেওয়ানজী।'

'মুকুন্দদেবের কথা যখন ভাবি অবাক হই—মহারাজ ইংরেজ জাতিকে চিনতে পারেন নি। বিরোধিতা করলেই হল না, দেখতে হবে আখেরে আমি কী পাচ্ছি। ঠিক বলেছি কিনা আপনিই বলুন?'

বকশী চুপ করে রইলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'আপনি হয়তো মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ঘটনাটা বিচার করবেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, ইংরেজ নীতিকেই রক্ষা করতে চেয়েছে। সরকারের খাসমহলের অধিকার একমাত্র সরকারেরই, প্রজাদের অন্যায় জবরদস্তি থেকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব সরকারের। তাহলে ওদের দোষ কী?'

বকশী বললেন, 'দেওয়ানজী, আমি সাধারণ মানুষ, রাজনীতি আমার আসে না।'

'তাই বুঝি?' কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন। 'মেজর ফ্লিচারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'না। এখনো সৌভাগ্য হয়নি।'

'চমৎকার মানুষ।'

'আজ আমি উঠছি দেওয়ানজী, অনেক পথ যেতে হবে।' বকশী উঠে দাঁড়ালেন।

'আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'একদিন আসুন দীনের কুটীরে—'

'আসব।'

কৃষ্ণচন্দ্র বকশীকে পালকিতে উঠতে সাহায্য করলেন।

আবার নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পালা।

পালকির শব্দ দূরের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

অন্দরমহলে বিষণ্ণ সুরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে।

ছয়

দিনগুলির চেহারা নির্বোধ ধূসর লাগে বকশী জগবন্ধুর কাছে। অস্তিত্ব পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। রাজবাড়ির দিকে চাইতে পারেন না, প্রতিমাহীন মণ্ডপের মতো খাঁখাঁ করে। মহারাজ নেই অথচ স্মৃতি আছে। গজপতি রাজবংশের তিন শতকের উজ্জ্বল ঐতিহ্য। স্বাধীনতাবোধ আর সম্মানের গৌরবে ভাস্বর। আজ রাজবাড়ি মৌন বিধুরতায় হতবাক্। বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না বকশীর। স্মৃতি ছোবল মারে রক্তে। রাজ্যের গাছপালায়, পাহাড়ে-পর্বতে, মন্দিরের গায়ে রাজবংশের অতীত কথা বলে। দুর্গের দিকে তাকাতে পারেন না। গোরাসৈন্যের আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আর সেই ভগ্ন প্রস্তর দিয়ে গড়ে উঠেছে ইংরেজের সরকারী ভবন। নতুন যুগ। বিধাতার কী নির্মম পরিহাস! পথ উচ্চকিত করে চলেছে গোরাসৈন্যের গর্বিত পদশব্দ। কখনো-সখনো মেজর ফ্লিচারের গাড়ি। এই মানুষটির সঙ্গে আলাপ হয়নি এখনো বকশীর। তবে তাঁর কৃতিত্বের সৌরভ উগ্র বুনো ফুলের মতো নাকে এসে লেগেছে বইকি।

সেদিন পাইক-বস্তিতে গিয়ে সব শুনেছেন, কিছু স্বচক্ষেও দেখেছেন। মেজরসাহেবের সমস্ত আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছে তাদের ওপর। জোর করে যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে ইমারত তোলার মজুরিতে খাটানো হচ্ছে। সৈন্যদের ওপর বেপরোয়া হুকুম আছে—সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করো। এমনভাবে আঘাত করো যেন চিরকালের মতো কোমর ভেঙে যায়, আর কোনোদিন সাপের মতো দাঁড়াতে না পারে। দরকার হলে ঘর জ্বালিয়ে দাও, মেয়েদের ইজ্জত লুটে নাও। বাধা দিলে সাবাড় করো।

কানে শুনেছেন বকশী, চোখে দেখেছেন ওদের দুর্দশার চিহ্ন।

ওরা প্রার্থনা জানিয়েছে ঃ 'দেবতা, পিতিবিধান করো।'

বকশী কথা বলেন নি। গম্ভীর হয়ে গেছেন। তরোয়ালে জং ধরেছে, ঢালে কীট। দেবতাও এখানে নীরব। তিনি ক্ষুধা-পিপাসায় পাথর। পাইক-বস্তিতে আকালের কালো ছায়া। বন্দী জানোয়ারের মতো একটা গোঙানি। ত্রাস চোখ জুড়ে, বুক জুড়ে দীর্ঘশ্বাস, আর উদরজোড়া ক্ষুধা।

বকশী একবার ভেবেছেন মেজরসাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু, পারেন নি। তাঁর কেমন মনে হয়েছে, আবেদন-নিবেদনে কিছু হবে না। তার চেয়ে সহ্য করো, অসহনীয়কে সহ্য করো।

বকশী পালিয়ে গেছেন ওদের সামনে থেকে। পালিয়ে গেছেন নিজের জমিতে। রোড়াং মৌজা। কিন্তু, চিন্তা দূর হয়নি। বরং জমির সামনে দাঁড়িয়ে আরও দুশ্চিন্তা জেঁকে বসে। জননীর মতো আপন সন্তানকে ঘিরে উদ্বেগ জাগে বকশীর। পাইকদের কালো কালো মুখ ভাসে চোখের পরদায়। ওরা কোলাহলে কানকে বধির করে তোলে। প্রেতচ্ছায়ার মতো ওরা তাকে অনুসরণ করে।

বকশী ক্লান্তিবোধ করেন, শূন্যতার ক্লান্তি। অশ্বও বোধ হয় প্রভুর মনের ক্লান্তি বুঝতে পেরেছিল। ঘোড়া ফেরার পথ ধরল।

খুরদা এলাকায় পড়তেই পেছনে চিৎকারে ভ্রষ্টচিন্তা বকশী ঘোড়া থামিয়ে মুখ ফেরালেন।

দেখলেন অশ্বারোহী গোরাসৈন্য। তাকে নির্দেশ করে চিৎকার করছে ঃ 'হল্ট।'

দুটো ঘোড়া এবার দাঁড়াল মুখোমুখি। উত্তেজিত।

গোরা সৈন্যের চোখ লাল। কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ।

বকশী শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গোরা ঘোড়া দাঁড় করিয়ে তাঁর পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

'হু আর ইউ? হাউ ডেয়ার—' বদখত গলায় গোরা গজগজ করে উঠল।

বকশী মাতাল সৈন্যের দিকে চেয়ে কি করবেন বুঝতে পারলেন না। একবার পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন।

গোরা আবার চিৎকার করে উঠল: 'হল্ট।'

বকশী দাঁড়ালেন।

গোরা বললে, 'মেজরের অর্ডার তুমি জানো না?'

'অর্ডার!'

'ইয়েস অর্ডার। কোনো নেটিভ ঘোড়ায় চড়তে পারবে না। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। ইউ ডেয়ার—'

বকশীর চোখের তারা শ্বাপদের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল। বললেন, 'আমি বকশী জগবন্ধু বিদ্যাধর মহাপাত্র ভবানবীর রায়।'

'তোমাকে মেজরের কাছে যেতে হবে।'

'না।'

'না!'

'না।' আর ওকে কিছু বলতে সুযোগ দেবার আগেই বকশী ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলেন। তীরবেগে ঘোড়া ছুটে গেল।

বকশী দেউড়ি ঠেলে বাড়িতে ঢুকলেন। লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে। সহিস ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে চলে গেল।

দরবার ঘরে পা দিলেন বকশী। কপালে স্বেদবিন্দু, কুঞ্চিত ললাট। ভৃত্যকে কড়া শরবতের নির্দেশ দিলেন। গদিতে বসে কিছু ভাববার চেষ্টা করলেন। মস্তিষ্ক নিরেট লাগছে। ঘটনার ধাক্কায় নুড়ির মতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছেন তিনি। একেক সময়—বকশী ভাবলেন: মানুষকে ঘটনার উর্ধ্বে উঠতে হয়। এও এক অবশ্যম্ভাবী নিদারুণ ট্রাজিডি। খুরদা কেল্লার জীবনযাত্রায় একটা অস্থিরতা, একটা ভাঙাগড়া চলেছে নিয়ত। নতুন-পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি একা, নিঃসঙ্গ। বিশাল শূন্যতা তাঁর অস্তিত্বকে পাকে পাকে

জড়িয়ে ধরছে। 'দেবতা, পিতিবিধান করো।' পাইকদের কালো কালো মুখ প্রেতের মতো তাঁকে তাড়না করছে. ক্ষুধা, অত্যাচার, হাহাকার—আকাশ ছেয়ে গেছে। বকশী কোন্‌দিকে যাবেন, কোথায় প্রতিবিধান খুঁজবেন। একটা অসহায়তা পীড়ন করে তাঁর মনকে।

সারারাত দুঃস্বপ্নের ভেতরে কাটিয়ে ভোরবেলা তন্দ্রা ভাঙল বকশীর।

ভৃত্য হাতে পত্র দিয়ে গেল। সরকারী অনুচর এইমাত্র এই চিঠি দিয়ে গেল। মেজর ফ্লিচারের চিঠি।

বকশী চিঠি খুললেন।

প্রিয় বকশী,

গতকাল আমার ফৌজের লোক আপনার সঙ্গে যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার করেছে তার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

এই ঘটনাটি কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, নিছক ভুল বোঝাবুঝির ফল। উক্ত অপ্রিয় ঘটনা যাতে পুনর্বার অনুষ্ঠিত না হয় তজ্জন্য আমি কর্মচারী-দের কড়া নির্দেশ দিয়েছি। ভবিষ্যতে আপনার চলাফেরার স্বাধীনতায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

খুশি হব একদিন আলাপ করতে এলে।

আপনার একান্ত

মেজর ফ্লেচার

নিরুদ্‌বেগ নিশ্বাস ফেললেন বকশী। যথারীতি স্নান করলেন, পুজো করলেন। মনের ওপর স্থায়ী একটা চাপ থাকলেও শান্তি পাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সত্যি কি শান্তি পাচ্ছেন তিনি। পাইকদের ভোঁতা চাউনি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার মতো ঝুলতে থাকে চোখের সামনে। কী করে ভুলবেন এই পদাতিক বাহিনীরই

সেনাপতি তিনি। তাঁরই নির্দেশ অনুগতের মতো ওরা পালন করে এসেছে। ওরা তাঁরই হাতে নেতৃত্বের রশি তুলে দিয়েছে। নেতৃত্ব! বকশী ভাবলেন : একটা গুরুদায়িত্ব। মেজরের সঙ্গে ওদের হয়ে একবার দরবার করবেন কিনা চিন্তা করলেন। বকশী এখন সব কিছু চিন্তা করে এগোতে চান। আর, এই চিন্তাই তাঁকে কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। পাইকদের হয়ে কিছু বলতে যাওয়ার অর্থ তাদের পক্ষ নেয়া। মহারাজার বিদ্রোহের সঙ্গী ওরা, ইংরেজ ওদের ক্ষমা করবে না। বকশীর ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মন বুঝতে পারে : ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা ওরা তাকে দিলেও দলগত কোনো কাজ করতে দেবে না। অন্তত, এই কয়েক দিনেই মেজর ফ্লিচার যেমন উৎপীড়নের রথ চালিয়ে গেছেন তাতে তাই মনে হয়। বকশীর মন দুভাগ হয়ে যায়। আর এই দ্বৈতসত্তার পীড়ন তাঁকে নিশ্চিন্ত হতে দেয় না।

এমন গুরুতর সমস্যায় বকশী কোনোদিন পড়েননি।

ইতিহাস এক নিষ্ঠুর নিয়ামক, বকশী আবার ভাবলেন। ইতিহাস-বিধাতা তাঁকে কোন্ ঘূর্ণিতে টেনে নিয়ে যেতে চায়। যদি তিনি বকশী না হতেন, যদি ওদের মতোই সাধারণ মানুষ হতেন! তাঁর বকশী খেতাব তাঁকে পেছনে টানে, তাঁর পরিবার, প্রিয়জন।

বকশী চারদিকে একটি বন্ধন অনুভব করলেন। নিজের কাছেই তিনি এতবড় বাধা আগে এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারেননি।

কয়েকদিন পর এক প্রত্যুষে দশ গাঁ থেকে মাতব্বর মাঝিরা এল তাঁর কাছে। বকশী ভেবেছিলেন এমন একটা কিছু হবে। তিনি না গেলেও ওরাই আসবে আর্জি নিয়ে। বকশী ওদের ফেরাতে পারেন না। দরকার-কক্ষে বসতে হল ওদের নিয়ে।

'দেবতা, পিতিবিধান করো, অত্যাচার আর সয় না।'

ওরা বোঝে না, বুঝতেও চায় না জমানা বদলেছে। প্রতিকারের ভার আর নেই বকশীর হাতে। একজন অন্ধ আর-একজন অন্ধকে কী করে পথ নির্দেশ করবে।

বললেন, 'সইতে হবে। যে সইতে পারে অত্যাচার তার কাছে কিছুই নয়।'

ওরা বলে, 'সইতে পারিনে গো। মানুষ তো বটে। আজই পাড়ায়-পাড়ায় ঢ্যাঁড়া দেছে আমাদের নিয়মমাফিক খাজনা দিতে হবেক। তা কোনদিন কোন রাজা আমাদের কাছে খাজনা চেয়েছে বলো দেখি।'

বকশী বললেন, 'কোনোদিন দিসনি ব'লে খাজনা দিতে হবে না, এমন কথা কে শুনবে। জমি ভোগ করলে সরকারকে খাজনা দিতে হবে বইকি।'

ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে বললে, 'শোনো কথা'।

বকশী ওদের বোকাটে চোখের দিকে চেয়ে হাসতে পারলেন না।

ওরা বললে, 'খাজনা আমরা কোনোদিন দিইনি, দিতে লারব। তা'পর বলে কড়িতে খাজনা নিবেক না তঙ্কায় দিতে হবেক। তুমি বলো দেবতা, অত্যাচার নয় ?'

বকশী এই খবর শোনেননি, পাইকদের ওপর খাজনা ধার্য হয়েছে জানতেন। কিন্তু সে-খাজনা যে টাকায় দিতে হবে শোনেননি। সমস্যা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে উঠছে। মেজর ফ্লিচার রাজবিদ্রোহের কারণে এই দুর্বিনীত পদাতিকদের শায়েস্তা করতে চান। অথচ বকশী জানেন, এরা সত্যিই দুর্বিনীত নয়, জমির সঙ্গে বাঁধা ওদের জীবনেও নির্দিষ্ট নীতি আছে, শিষ্টতা আছে। এরা অনুগত। প্রভুর প্রতি আনুগত্য কি অপরাধ ! বর্তমান সরকারও তো এদের প্রভু হতে পারতেন। এদের শৌর্য বীর্য সরকারেরই শক্তি বৃদ্ধি করত! অন্তত তিনি সরকার প্রতিষ্ঠা করলে এদের শক্তিকে অত্যাচারের কামান দেগে গুঁড়িয়ে দিতেন না, ওদের শক্তির দৌলতে দৃঢ় দুর্গ গড়ে তুলতেন।

বকশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। আর, বার বার তাঁর সত্তা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত চিন্তা তাঁকে অগ্রসর হতে দেয় না।

নিজেকে মনে হয় ইতিহাস-বিধাতার এক অন্ধ অস্ত্র। নিয়তি তাকে শেকলে জড়িয়ে রেখেছে। তাঁর সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে কাঁধ চুলকোতে গিয়ে একটা বিরাট পাথরকে নড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে কী বকশী পাথর নড়াতে পারেন! কোন্ পুরাণে পড়েছিলেন একটা লোককে ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছিলেন। সে সারাদিন রক্তাক্ত পরিশ্রমে একটা প্রস্তরখণ্ডকে পাহাড়ের চুড়োয় টেনে তোলবার চেষ্টা করত। আর পাথরটা বার বার গড়িয়ে পড়ত নিচে। সেই পৌরাণিক কাহিনীই কেন মনে পড়ল বকশীর। মানুষের চেষ্টা পরিশ্রম ব্যর্থ জেনেও তাকে চেষ্টা করে যেতে হয়। পাথরের ধর্ম গড়িয়ে পড়া, আর মানুষ নিয়ত তাকে টেনে তোলবার প্রয়াস পাবে।

একটা কিছু করতে হবে। তিনি বকশী, সেনাপতি। পদাতিক-বাহিনী তাঁর মুখ চেয়ে আছে।

সামনে উঁচু-হয়ে-বসা ভাঙাচোরা মানুষগুলোর ওপর তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। চওড়া কাঁধ, চওড়া কবজি। এরা একদিন রুখেছে মুঘল-মারাঠা বাহিনীকে। দুর্ভেদ্য অপরাজেয় খুরদা।

বকশী নিশ্বাস ফেললেন। 'তোমরা এখন যাও। দেখি আমি কী করতে পারি।'

ওরা বকশীর জয়ধ্বনি করে বিদায় নিল।

তবে কী তিনি একবার মেজর সাহেবের কাছে দরবার করবেন। তার অর্থ পক্ষ নেয়া। পক্ষ নিতে হবে। তিনি তো তৃতীয় পক্ষে থাকতে পারেন না। যতদিন তিনি বকশী ততদিন তাঁকে একটা পক্ষ নিতে হবেই। মানুষের শ্রদ্ধা বিশ্বাস প্রীতি সবচেয়ে বড় জিনিস। আশ্চর্য, বকশীর ক্লান্ত চোখের তারায় আবেগ ঘনাল : এ কথা তিনি কী করে ভুলে ছিলেন এতদিন। তাঁর পরিবার, প্রিয়জন থেকে তো ওরা কেউ আলাদা নয়। ওদের ভালোবাসা না পেলে আত্মীয়দের তিনি ভালোবাসেন কি করে। হৃদয় তো আকাশের মতোই বিপুল উদার, স্বার্থপর তো নয়।

'বাবা—'

পার্বতী। দশ বছরের কন্যা। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল চোখে-মুখে বিপর্যস্ত।

'তুমি যে বলেছিলে আমাদের বজরা করে চিল্‌কায় বেড়াতে নিয়ে যাবে।'

'যাব মা যাব।'

'কবে ?'

'শিগগির।'

'না যদি নিয়ে যাও কোনোদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

বকশী হাসলেন। 'যাব রে পাগলী যাব—'

পার্বতী হাততালি দিল। খিলখিল করে হাসল। তারপর প্রজাপতির পেছনে ছুটল।

বকশী ওর ছোট্ট শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন একটা গতিময় আনন্দ। বকশী এখন সব কিছুতেই আনন্দের রস পাচ্ছেন। তাঁর ভালোবাসার ক্ষমতা বেড়ে গেছে।

আজ অনেকদিন পর তাঁর সেই পাইক যুগল যুবক-যুবতীর কথা মনে পড়ল। কী যেন নাম? দীপ আর নুরান। শ্রীক্ষেত্রে ওদের দাম্পত্য জীবন এতদিনে নিশ্চয়ই ফুলে পল্লবে শোভিত হয়ে উঠেছে। প্রেমের অংকুর জাগবার আগেই তাঁর বিবাহ হয়েছে। বংশের এই রীতি। বধূ তখন বালিকা। এই পার্বতীর মতোই বয়স। বাদ্য-আলোক আর সজ্জিত অশ্বে তাঁর বীরমূর্তি বরবেশে। কী-এলাহী উৎসব। বকশী মুখ মুচকি হাসলেন। স্ত্রীকে ডেকে বিগতদিনের মধুর স্মৃতিগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে লজ্জা দিতে ইচ্ছে করছে।

না। বকশী সেসব কিছু করলেন না। ভৃত্যকে ডেকে অশ্ব প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন। তিনি পোশাক পরতে গেলেন।

'আসুন আসুন। কী সৌভাগ্য।' মেজর ফ্লিচার এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন।

মেজর সাহেবের খাস কামরায় প্রবেশ করলেন বকশী। আসন গ্রহণ করলেন।

'একটু পানীয়ের ব্যবস্থা করি, কী বলেন ?' মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

বকশী বললেন, 'তার প্রয়োজন হবে না।'

'বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে।' মেজর বললেনঃ 'আমার কর্মচারীর সেদিনকার ব্যবহারে আমি আন্তরিক দুঃখিত। আশাকরি আপনার চলাফেরার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না?'

'না ধন্যবাদ।' বকশী হাসলেন।

'অসুবিধে হলে বলবেন।' মেজর বললেনঃ 'শান্তি আর শৃঙ্খলা এই আমরা চাই।'

বকশী বললেন, 'আমি এসেছি মেজর সাহেবের কাছে আর্জি নিয়ে—'

মেজর বললেন, 'নিশ্চয়ই। বলুন কী করতে পারি ?'

বকশী এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, পরে বললেন, 'আপনি জানেন পদাধিকারবলে আমি মহারাজার সেনাপতি। ইচ্ছে করলেও সে-অধিকার আমার ছাড়বার উপায় নেই।'

মেজর হাসলেন। 'কে ছাড়তে বলছে ? মুকুন্দদেবের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা। আসলে খুরদা রাজ্য আছে এবং কে বলতে পারে একদিন আবার মহারাজার হাতেই আমরা রাজ্য ছেড়ে দেবো না! আমাদের কর্তৃত্ব নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার।'

বকশী বললেন, 'সেনাপতি হিসেবেই আপনি বুঝতে পারছেন আমার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর ওপর স্বাভাবিকভাবেই কিছু দায়িত্ব এসে যাচ্ছে। আমি বিশেষ করে পদাতিকবাহিনীর কথা বলছি—'

'ইউ মিন পাইকস্—দোস্ বাস্টার্ডস—ডার্টি পিগ্স—' মেজরের শান্ত মূর্তি এক লহমায় রুদ্র রূপ ধারণ করল। তিনি আসন ছেড়ে সশব্দে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তাঁর হাতের চাবুক জুতোয় আঘাত করছিলেন। একটু থেমে বললেন : 'লুক হিয়ার বকশী, দোস্ নেকেড্ রাসকেলস্ আর কনস্টাণ্ট লায়াবিলিটিস অন আওয়ার হার মেজেস্টিস্ গভর্নমেণ্ট।'

বকশী বললেন, 'মেজর, ওদের দোষ কী। ওরা মহারাজার একান্ত অনুগত। রাজানুগত্য কী অপরাধ?'

মেজর বললেন, 'আহ হেট্ দ্যেম। মাননীয় বকশীর তরফ থেকে ওদের সম্বন্ধে কোনো ওকালতি আমি পছন্দ করিনে। আই অ্যাম্ সরি। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই আমাদের নীতি। আপনি জানেন না বকশী, ওরা সরকারী কর্মচারীদের অকারণে উত্যক্ত করেছে। খাজনা আদায়ে গেলে খাজনা দেয় না—দে রিফিউস্। দে ওয়াণ্ট টু হ্যারাস্ মাই মেন্।'

বকশী বললেন, 'তার কারণ ওদের খাজনা দেবার কোনোকালে অভ্যেস নেই, দেয়ও নি কোনোদিন।'

'বাট্ ক্যান্ আই আস্ক হোয়াই? কোনোদিন দেয়নি বলে আজ দিতে হবে না, দ্যাট্স নো লজিক্।'

বকশী বললেন, 'খাজনা না দিতে পারলেও ওরা দরকারমতো কাজকর্ম করে দিত।'

মেজর বললেন, 'ইউ মীন্ দেয়ার সারভিস্। দিস্ ডার্টি রাফি-য়ান্স, আমাদের কী সার্ভিসে তারা লাগবে! ও নো। দে শুড্ কম্ টু রিয়েলাইস্ লিবার্টি ইজ নো লাইসেন্স। তাছাড়া আমরা ইংরেজরা এদেশে একটা আদর্শ নীতি স্থাপন করতে চাই। সেন্টি-মেণ্টালিটি নয়। নীতিই দেশকে শাসন করে, ভাবাবেগ নয়। আমার তাবৎ প্রজারা খাজনা দেবে, দিচ্ছে; পাইকরা দেবে না কেন? নমিনাল খাজনা তাদের কাছে চাওয়া হয়েছে। সেইটেই

নীতি। আমাদের দিক থেকে ওদের দিক থেকেও এই নীতিকে পালন করা অবশ্যকর্তব্য। অ্যাম্ আই নট্ ক্লিয়ার্ ?'

বকশী চুপ করে রইলেন। বুঝলেন মেজরের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। বকশী উঠে দাঁড়ালেন। 'বেলা হল। আজ তাহলে চলি মেজরসাহেব।'

মেজর তাঁকে এগিয়ে দিলেন। 'দেখুন বকশী, আশা করি আমার পয়েণ্ট অব্ ভিউ আপনি বুঝতে পেরেছেন। জাস্টিস্! ইউ হ্যাভ নো রাইট্ টু স্যাক্রিফাইস্ জাস্টিস ফর্ সেনটিমেণ্টাল গ্রাউণ্ড। আবার দেখা হবে। গুড্ বাই।'

বকশী ঘোড়ার লাগাম ধরলেন।

সাত

একটা ছায়া প্রেতের মতো বকশীকে দিনরাত অনুসরণ করে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ছায়া, নিঃশব্দ এবং গম্ভীর দীর্ঘ রোগ ভোগে ক্লান্ত মানুষের মতো মনে হয় নিজেকে। ছায়াটাও বোধ করি ওঁর দুর্বলতারই সূচক।

বাড়ি থেকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকেন না, ছায়া তাড়া করে।

কদিন থেকে আর-একটি উপসর্গ জুটেছে। সারাক্ষণ একজন লোক তাঁর বাড়ির সামনে চলাফেরা করে, দাঁড়িয়ে কিসের গন্ধ শোঁকে। বাইরে বেরুলে পেছনে তার অস্তিত্ব বোধ করতে পারেন বকশী। একজন লোক তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছে, এটা এক বিশ্রী যন্ত্রণা।

বকশী চোখের সামনে জলদ্ পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করে বিমূঢ় হলেন। খুরদা রাজ্য পাল্‌টে যাচ্ছে। নতুন সরকারি ভবনের জন্যে নয়, সিপাহীদের সদম্ভ উপস্থিতিতে। এই পরিবর্তনের ধাক্কা সমাজজীবনের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে। চাষী-নায়েব-গোমস্তার সঙ্গে আর-এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। এরা মহাজন। টাকা ধার দেয়, কড়ির বদলে টাকা পাওয়া যায়। টাকা ছাড়া নতুন রাজত্বে সব কিছু অচল। খাজনা দাও, টাকা। খরিদ করো, টাকা।

আর এই টাকার একচ্ছত্র লেনদেনের ভার মহাজনদের হাতে।

কড়ির দাম চড়ল। বাজারে দুষ্প্রাপ্য হল।

নতুন সরকার কড়ির দাম বেঁধে দিয়েছে। পাঁচ হাজার একশো কুড়ি কড়ির সমান এক টাকা। ফেলো পাঁচহাজার একশো কুড়ি।

এতেও নিস্তার নেই। মহাজন বলে ঃ ওতো সরকারি হিসেব।

আমার কী থাকল? অতএব পাঁচহাজার নয়, দাও সাতহাজার ছশো আশি।

আমলারা বলে, ওতো সরকারি তহবিল। আমার জন্যে কিছু ছাড়ো।

কড়ায়-ক্রান্তিতে অর্থের পরিমাণ বিভীষিকা সৃষ্টি করল।

দিনের পর দিন শীতল কৌতূহলে এই পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করলেন বকশী।

কেনা-বেচার প্রক্রিয়ার মধ্যে নতুন এক দালাল দেখা দিল; যার কাজ মধ্যস্থতা করা। সেটা রুপিয়া। ধাতুখণ্ড তার নির্দিষ্ট আকার আছে, ওজন আছে, আছে ঝংকার।

আর বিনিময়-প্রথার প্রয়োজন নেই। টাকা ফেলো জিনিস খরিদ করো।

কৃষি অর্থনীতি মহাজনের গদিতে বাঁধা পড়ল। দেশে বাজার ছিল না, গঞ্জ ছিল না, ছিল না দোকানপাট।

চোখের সামনে এই নতুন জীবনের সূত্রপাত দেখলেন বকশী।

তামাম রাজত্ব সমেত মহারাজা দৃশ্যপট থেকে অপসারিত হলেন। তাঁর বাতিল ধ্বংসস্তূপে পরিণত দুর্গের পাথরে পড়ে উঠল সরকারি দপ্তর।

পুরাতন দিনগুলির প্রতি বিষণ্ণ আসক্তি জড়ানো রয়েছে বকশীর মনে। এই ফাজিল নবীনকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। এর আভিজাত্য নেই, গৌরব নেই, যেন তস্করের সিঁধকাটা নিষ্প্রভ একটা প্রদর্শনী।

বকশী নিজেও অতীতের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছেন। তাঁর চেয়ে এখন মহাজনদেরই আকর্ষণ বেশি।

আগে সমস্ত সমাজ ছিল নৈবেদ্যের চুড়োর মতো। চুড়োয় ছিলেন মহারাজা, তাঁর নিচে বকশী, সকলের নিচে পদাতিক আর জনসাধারণ। আকাশে চন্দ্র সূর্য দেবতা, মৃত্তিকায়

দেবোপম মহারাজা। মন্দির-মঠে-বাঁধানো পুষ্করিণীতে উৎকীর্ণ সেই ইতিহাস।

ইতিহাস! বকশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন: ছলনাময়ী নারী, যখন যার অঙ্কে তখন তার।

ঘোড়ায় চেপে মাঝে মাঝে তাঁর মহলে বেরিয়ে যান বকশী। রোড়াং। এখানেই বুঝি শুধু পুরনো দিনের স্মৃতি শ্যামল শীতল-পাটি বিছিয়ে আজো শান্তি দেয়। উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখেন বকশী। মেঘের লাল তীরগুলি দেখেন। আর মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলেন: ইনি বসুমতী, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। তাঁর পীবরোন্নত স্তনে অকৃপণ দুগ্ধ। যেন হারিয়ে-যাওয়া শৈশবের মধ্যে ফিরে গিয়ে তিনি যুগলস্তনের স্তব করেন।

এক অবসন্ন দ্বিপ্রহরে নবীন যুবকটি এসে দেখা করল বকশীর সঙ্গে।

কোঁচানো মেয়েলিপাড়ের ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, আর জরির কাজ করা উত্তরীয়।

বকশী আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

যুবক হেসে বললে, 'দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। আমি এখানে নতুন কিনা।'

'দাদা!'

'দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র আমার দাদা। আমার নাম গৌরহরি। এই দেখুন দাদার চিঠি।'

বকশী চিঠি পড়লেন।

'গৌরহরি, আমার ভাই, আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। ও এই এলাকার সরকারি তহশিলদারের চাকরি নিয়েছে। কাজেই এখানেই থাকবে। দেখে শুনে ওর একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে বাধিত হব। —নিবেদক: কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ।'

বকশী চিঠি শেষ করে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'এতক্ষণ বলতে হয়। দেখুন তো কত কষ্ট হল। যতদিন ব্যবস্থা না হয় আমার এখানে কোনো অসুবিধে হবে না। আসুন আসুন। দেওয়ানজী সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন তো?'

বকশী গৌরহরিকে মণ্ডপ-গৃহে এনে বসালেন।

গৌরহরি বললে, 'দাদা সুস্থ আছেন। শুনেছেন তো দাদা দেওয়ানি ছেড়ে দিয়েছেন?'

বকশী বললেন, 'হ্যাঁ।'

গৌরহরি বললে, 'দাদা কয়েকদিন পরে আসতে পারেন।'

'আর এসেছেন।' বকশী হাসলেন: 'এতদিন তো আনতে পারলাম না। এবার যদি ভায়ের টানে আসেন।'

গৌরহরি বললে, 'দাদা এত ব্যস্ত মানুষ…'

বকশী বললেন, 'হুঁ। তারপর বাঙলাদেশ থেকে কবে আসা হল? নৌকা-পথে তো?'

'গত সপ্তাহে পৌঁছেছি কটকে। উঃ পথ বটে। যাকে বলে মহাপ্রস্থানের পথ।'

'কোন্ কোন্ মহলের ভার আপনার ওপর?'

'আপাতত খাসমহলগুলো। তারপর জানি না সরকারের কী ইচ্ছে। মেজর সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। দাদা পরিচয়পত্র দিয়ে দিয়েছেন।'

'বেশ তো যাবেন। আপাতত বিশ্রাম। স্নানের ব্যবস্থা করতে বলি। দেখবেন আবার গরিবের আতিথেয়তায় ত্রুটি না পান।'

'না। সে ভরসা আপনাকে দিচ্ছি!' গৌরহরি হাসল।

গৌরহরি মানুষটি অত্যন্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণ। তার চরিত্রে একটি ফাজিল দিক আছে। একমাত্র ভয় অভিবাবক দেওয়ান দাদার। এখানে, খুরদা রাজ্যে মাথার ওপরে খোলামেলা আকাশ

ছাড়া কিছু নেই। আর সব সময়েই এলোমেলো হাওয়ায় বিস্রস্ত হবার সুযোগ পাওয়া যায়।

কয়েকদিনের ভেতরে সে নিজস্ব বাসস্থান পেল। রান্নাবান্না যাবতীয় কাজের জন্য একটি স্ত্রীলোকও জোগাড় হল। গৌরহরি তার দপ্তর খুলে বসল। তার অধীনে কয়েকজন মহুরি। ওরাই আসলে আদায়পত্তর করে। গৌরহরি টাকা গুনে জমা নেয়।

অফুরন্ত অবকাশ। দেশে থাকতে আলকাপের অনেক গান ওর মুখস্থ। হারমনিয়মও সঙ্গে এনেছে। গানের টানে কিছু শাকরেদও জোটে। এবং নিষিদ্ধ মাংস ও পানীয়তে আপত্তি নেই গৌরহরির। রাত্রিকে নিঃসঙ্গ কাটতে দেয় না গৌরহরি। সরকারি তহশিলদারকে সৌজন্য জানাতে ভোগ্যবস্তুর অভাব হয় না।

গৌরহরি লোকটার কোনো কাজে নিজস্ব উৎসাহ নেই। কিন্তু সে দেখল তার চাকরিটা এমন জাতীয় যে চেষ্টা ছাড়াই আরামে থাকা যায়। বস্তুত চাল কিনতে হয় না, মাছ, শাকশবজি তাকে কৃতার্থ করতেই যেন হাজির হয়। সরকারি কর্মচারী বলে কথা। প্রাতঃপ্রণাম কোনোদিন মুরগী, কোনোদিন আণ্ডায় পুণ্য অর্জন করে। গৌরহরি কুঁড়েমি করে। ঘুমোয়। হাই তোলে। আর আলকাপের সুর ভাঁজে।

মাঝে মাঝে বকশীর ওখানেও যায় বইকি!

গৌরহরি গ্রামের মানুষ। শহরবাসে তার রুচি নেই। গ্রাম্য ঘেরাটোপে তার মনের গড়ন চোয়াড়ে, স্বার্থপর, আত্মসুখী, এবং অসৎও বটে।

বকশী ছাখেন আর ভ্রাবেন। চিন্তাগুলি তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। গৃহপ্রাচীরে দাঁড়িয়ে সমস্ত রাজ্যকে আলগা হয়ে খসে পড়তে ছাখেন। আশ্চর্য হন। বাইরের থেকে এক ধাক্কায় কেমন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, হতে পারল। তার অর্থ এর ভেতরের শক্তিই ফুরিয়ে গিয়েছিল, কেউ জানতে পারেনি। ভাঙছে, সব ভাঙছে।

এতদিনকার শ্রদ্ধা-প্রীতি-বিশ্বাসে গড়ে ওঠা জীবনধারনের শর্তগুলি। নতুন কোনো প্রত্যয় আঁকড়ে ধরতে পারছেন না। যতদিন যায় নিঃস্ব, নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছেন বকশী। এই ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার কোনো অর্থ নেই, কোনো গৌরববোধও করেন না। স্মৃতির পিঞ্জর-জালে বদ্ধ প্রাণীর মতো বোধ হয় নিজেকে।

বকশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

এবং যতই স্মৃতির দুয়ার থেকে আশ্রয়চ্যুত হন ততই আকুল হয়ে আঁকড়ে ধরেন তাঁর কিল্লা। রোড়াং। আদিগন্ত সবুজ, ঢেউ খেলানো টিলা আর মাটির সোঁদা গন্ধে নিজেক মগ্ন করে রাখেন। দুর্বল অথচ জেদি সন্তানের মতো মনে হয় নিজেকে। এবং কৃপণ উত্তপ্ত বাহুর আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরতে চান এই সঞ্চয়কে। এই জমিন, ওই ওপরের আকাশ তাঁর, তাঁরই, একটা সম্পূর্ণ অধিকার-বোধ তাঁকে যেন গৌরবের অহমিকা দান করে। সমূহ বর্তমান মিথ্যা হয়ে-হয়ে কিছু সত্য হয়ে টিকে আছে এর মাটিতে। রোড়াং।

সারা রাত্রি অনিদ্রায় কাটে। পুঞ্জীভূত অন্ধকারে পাহাড়-দুর্গ-অরণ্য একাকার হয়ে যায়। এত অন্ধকার সারা জীবনে ছাখেননি বকশী। একটা বন্য বরাহের মতো ভয়ংকর। আর, তাঁর অব্যবহারে জীর্ণ তলোয়ারে সাহস পান না। ওই বরাহটা নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে, যতদিন বাঁচবেন এগিয়ে আসবে। অথচ—

প্রেতের মতো তাড়া খেয়ে খেয়ে বকশী কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

বকশী কয়েকদিন স্বেচ্ছায় বাড়িতে বন্দী হয়ে রইলেন। তাঁর বিশ্রামের দরকার। নিয়ত বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এমন লড়ায়ে আগে তাকে পড়তে হয়নি। এখন তার মনই প্রধান শত্রু। হুংকার তুলে তিনি বেআদপ পাইককে শায়েস্তা করতে পারেন, কিন্তু মন! অথচ—কটকে ইংরেজ পদার্পণ করামাত্র বকশীই গিয়েছিলেন সরকারের অধীনতা স্বীকার করতে। রোড়াং মৌজার বন্দোবস্তও সরকার করেছে তাঁর সঙ্গে। বস্তুত তাঁর

অধিকার থেকে তিনি বিন্দুমাত্র সরেননি। তবু কেন মন এতো নারাজ, বকশী হাসেন : এ একধরনের বিলাস, প্রাচীন বিলাসিতা। জীবন ধারণের পক্ষে এই বিলাসিতা কী দরকার! বকশীর মনের ভেতরে বিচিত্র দ্বন্দ্ব। বকশী আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছেন। বাস্তবে পলাতক আধুনিক মানুষের দার্শনিকতা ভিড় করে আসে চিন্তায়। বাঁচতে হলে এছাড়া অন্য উপায় নেই।

তবু বন্য বরাহের অন্ধকার প্রতীকটি তাঁকে তাড়া দেয়। খুরদা রাজ্যে এখনো চন্দ্রসূর্য ওঠে। রাস্তাঘাটে সিপাই, গোরা, মাদ্রাজী, বাঙালী। চারদিকের সমস্ত শৈথিল্যকে ধুলো উড়িয়ে তারা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষ কথা বলে না, হাসে না। টাক্সের বোঝা, কড়িতে চলবে না, চাই রুপিয়া। মহাজনের গদিতে লক্ষ্মী বাড়বাড়ন্ত। তহশিলদার, আমিন। ক্রমশ এই রাজ্যের একটি সরকারী ছাঁচ গড়ে উঠছে।

এই রাজ্যে একদিন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, ছিলেন বকশী। ছিলেন দেবতা। পাল-পার্বণে রাজ্য মুখরিত ছিল। এখন পুরু মুখবন্ধ অন্ধকারে নিশ্চুপ। ভয়, প্রচণ্ড আকারের নাম-না-জানা বিভীষিকার ছায়ায় মানুষ কাঁপছে। ভয়! বকশী মনে মনে উচ্চারণ করলেন : যে-মানুষ ভয় করে সে মরে গেছে। ভয়ই তাদের মেরে ফেলেছে। এ মৃত পুরীতে তিনি একাই কী জীবন্ত! না : তিনিও হয়তো কবে মরে গেছেন, কিংবা যাবেন। শ্মশানে দ্বারপালই শুধু জেগে থাকে।

বকশীর একটি চিত্র মনে পড়ছে। একটি মুখ। পিছনে ও সামনে। পিছন দিয়ে সে অতীতের দিকে চোখ রেখেছে, সামনের মুখ সামনে। এই যুগ্মমুখটি যেন বকশীরই। বিচিত্র আবেগগুলি আবার তাঁকে দ্বন্দ্বমুখর করে তোলে।

চিন্তাগুলি মাথায় নেবেন না ভেবেও বার বার একই বৃত্তে ঘুরতে থাকে। কিংবা বাস্তব কুশলতা হারিয়ে চিন্তাগুলিই তাঁর কাছে কাজ

হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন : এই ভাবনারাশির বন্ধন থেকে আমাকে উদ্ধার করো।

একেকটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত গত হচ্ছে। বকশীর সাধ জাগে : একটা কিছু হোক, অলৌকিক কিছু, যার থেকে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

বকশী চিৎকার করে ডাকলেন : 'কে আছো?'

ভৃত্য ছুটে এল। 'দেবতা—'

'আমি কাল ভোরে চিল্‌কা যাব। ব্যবস্থা করে রাখবি।'

ভৃত্য অবাক্‌ হল। তবু মাথা নাড়ল।

'আর পার্বতীকে ডেকে দিবি।'

পার্বতী এলে ওকে কাছে টেনে নিলেন বকশী। মেয়েটা যেন রোগা হয়েছে, মনে হল বকশীর। পিতৃত্বের উদ্বেগে তাঁকে এখন ঘরোয়া দেখাল।

'কাল ভোরে চিলকায় যাচ্ছি। তোকে নিয়ে যাব।'

'সত্যি? কী মজা, কী মজা।' আনন্দে কলকল করে উঠল পার্বতী।

আর, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বকশীর মনে হল পৃথিবীতে কিছু সুখ আছে। ভালোবাসা। রৌদ্রকরোজ্জ্বল ধানখেতে নেমে পড়েছেন যেন, পুষ্ট ধানের চারার উত্তাপ গন্ধ। বকশীর মনে হল এর বিনিময়ে তামাম রাজত্বকেও বিলিয়ে দেয়া যায়। যদি এই নিষ্ফল উপচিত গৌরবগুলিকে ফেলে ছুঁড়ে দিয়ে সাধারণ মামুলি মানুষ হতে পারতেন! স্নেহশীল পিতা, কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামী।

আট

বিবৃতজঘনা চিল্‌কা আকাশের দর্পণে মুখ দ্যাখে।

জল, জল, আর জল। বিকেলের গোধূলি রঙ পড়েছে চিল্‌কায়। সে রূপসী হয়ে উঠেছে। তার জলের শরীরে স্থির যৌবন আটকানো। মাথার ওপর দিয়ে মালার মতো এক দল পাখি গান গাইতে-গাইতে চলে গেল।

বকশী জগবন্ধু বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে। পাশে পার্বতী। তার চোখে কৌতূহল।

কতবার চিল্‌কায় এসেছেন বকশী। পাখি শিকারে। মহারাজও এসেছেন। সে সব পুরনো দিনের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গেছে দূরের নক্ষত্রালোকের মতো। কত পূর্ণিমার দুধশাদা আলোয়, নর্তকীর নূপুর নিক্কণে চিল্‌কা অভিসার সজ্জায় মেতে উঠেছে।

আর, এখন নিয়ত গোরা সৈন্যের বোট ইতস্তত পাহারা দিচ্ছে। দু'একবার বকশীর বজরারও অনুসন্ধান করে গেছে। বকশী নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারেন না। কতকগুলি চোখ সব সময়ই তাঁকে লক্ষ্য করছে।

হ্রদের তীরে ছাড়াছাড়া বসতি। পাইকদের। ওরা হয়তো এখনো তাঁর আগমনের খবর পায়নি। ভালোই হয়েছে। বকশী আর ওদের পরিচয়ের বাঁধনে ধরা পড়তে চান না।

তাঁর দিন শেষ হয়েছে, বকশী নিশ্বাস ফেলে বললেন।

ছেঁড়া ছেঁড়া বসতিগুলিতে এই অপরাহ্লেই যেন ধূসর অন্ধকার নেমে এসেছে। কোথাও কোনো সাড়া নেই। আসন্ন অন্ধকারেও কোথাও কোনো বাতির চিহ্ন নেই। হ্রদের নির্জনতা তাদের জীবনযাত্রাকেও যেন গ্রাস করেছে।

আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুটে উঠছে। চিল্‌কা জলের রঙ পালটাচ্ছে। চারদিকে নিস্তব্ধতা। কেবল বজরার গায়ে আঘাত খাওয়া জলের শব্দ।

অন্ধকার নেমে এলে বকশী বজরাকে তীরে ভেড়াতে আদেশ করলেন। পার্বতীর খাওয়া-দাওয়ার তদারক করলেন। ওর হাজারো প্রশ্নের জবাব দিলেন। তারপর ক্লান্ত কন্যা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

বকশী বজরার ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। জলের ভিজে গন্ধ। আজ বোধ করি চাঁদ উঠতে দেরি আছে। অন্ধকার ক্রমশ জটিল হচ্ছে।

বকশী বজরা থেকে নিঃশব্দে তীরে নামলেন। নেমে দাঁড়ালেন। নাঃ কাছে কোথাও গোরাদের বোট দেখা যাচ্ছে না। আশ্বস্ত হলেন। ধীর পায়ে বসতির উদ্দেশে এগিয়ে চললেন তিনি। এখানে সেখানে কুটীর, গায়ে গায়ে জড়িয়ে-ধরা। বকশীর মনে হল যেন ভয় পেয়ে মূক পশুর মতো ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। ভয়! বকশী মনে মনে উচ্চারণ করলেনঃ যে ভয় পেয়েছে সে একেবারে মরে গেছে। মানুষ মরবেই, কিন্তু ভয়-পাওয়া মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত কুৎসিত।

সমস্ত পল্লীর ঝাঁপগুলি বন্ধ। অন্ধকার। মানুষ আছে কি নেই।

বকশী একটি কুটীরের সামনে দাঁড়িয়ে দোরে করাঘাত করলেন।

কোনো শব্দ নেই।

বকশা ডাকলেনঃ 'কে আছো?'

অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে অর্ধ উলঙ্গ মূর্তি বেরিয়ে এল।

'দেবতা'—চিঁ চিঁ করে বলল লোকটা।

'এ কী চেহারা হয়েছে তোর, হ্যাঁ রে পলু?'

'দেবতা, আর সয় না। মানুষ তো বটেক। ক্ষুধা গো বড় ক্ষুধা। আমরা খেতে পাই না! ভুখায় দেহ পোড়ে।'

বকশী আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন? তোদের জাত-ব্যবসা? ছেড়ে দিয়েছিস?'

'ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে গো। সরকার কানুন করেছে--কেউ নিমক তৈরি করতে পারবে না। গবরমেণ্টো ব্যবসা হাতে নিয়ে নিয়েছে, দেবতা। সরকারের সিপাই পাহ'রা দিচ্ছে চিল্‌কায়। পল্লীতে ঘুরে টহল দিচ্ছে। নিজের খাবার তরেও কেউ লবণ তৈরি করতে পারবে না।'

বকশী স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'তা আপনিই বলেন দেবতা, আমরা বাঁচি কী করে? আমরা মুখ্যু মানুষ, গবরমেণ্টার কাছে আমাদের আর্জি কে জানাবে? তামাম পল্লীতে ঘুরে দেখেন, কেউ খেতে পায় না। আমাদের পরিবার মরছে ক্ষুধায়।'

অতীতের স্মৃতি বকশীর চোখের সামনে দুলতে থাকে। এখানকার স্থানীয় লোকেরাই একদা লবণ তৈরি করত। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অবসর সময়ে তারা লবণ তৈরি করত। এই ছিল তাদের রোজগারের ধান্ধা। পাহাড়প্রমাণ লবণ জমে উঠত। সারা উড়িষ্যায় পাঠিয়েও এত বাড়তি থাকত যে জলপথে চালান হত ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত। সেদিনকার মানুষের কাছে লবণ এত সহজপ্রাপ্য বস্তু ছিল যে কেউ গণনায়ও আনত না।

'তা দেখেন দেবতা, ব্যবসা তো গেল, এখন আমাদেরি কিনতে হচ্ছে দাম দিয়ে। মণকরা দু' রুপিয়া ছয় আনা। আপনার গিয়ে সেরে কত পড়ল?'

দু'টাকা ছয় আনা মণ লবণ। বকশী আশ্চর্য হলেন। গোরা সরকার লবণ একচেটিয়া করে তার দাম বাড়াল শতকরা চারশো থেকে পাঁচশো ভাগ। অথচ—এই সেদিন মারাঠা আমলেও লবণ

যে এমন মূল্যবান জিনিস হতে পারে, কেউ কল্পনাও করেনি। মাত্র তিন আনায় একমণ লবণ মিলত। এক সের শস্যের বিনিময়ে এক মণ লবণ অনায়াসে পাওয়া যেত। সেই লবণ এখন দু'টাকা ছ' আনায় বিকোচ্ছে। ফ্লিচার সাহেবই প্রথম লবণের সরকারী এক-চেটিয়া নীতি গ্রহণ করলেন। মিঃ কিং উড়িষ্যার প্রথম লবণের এজেন্ট। সিপাহীরা জালের মতো ছড়িয়ে পড়ল পাহারা দিতে। 'জালের মতন' উপমাটা ভালো লাগল বকশীর: আর মানুষ মাছির মতো আটকে পড়ল জালের ঘেরাটোপে। চিল্‌কায়, পুরীতে লবণ-এজেন্টের খবরদারি প্রতিষ্ঠিত হল।

বকশীর মনে হয় এ এক মস্ত ধাঁধা। মারাঠারাও যা সাহস করেনি, এরা এসেই দু'এক বছরের মধ্যেই যেন মানুষগুলোকে বেঁধে ফেলল। এই বিদেশী মানুষগুলো, সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে। ইতিহাস-বিধাতা, বকশী নিশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করলেন: মুষ্টিমেয় ইংরেজ- সৈন্য মারাঠার বিপুল বাহিনীকে নিমেষেই ছত্রখান্ করে দিল। এরা বিজয়টীকা নিয়ে এসেছে। আশ্চর্য! এই লাখো লাখো জনতা ওদের অঙ্গুলিহেলনে নিমিষে মূষিক হয়ে গেল। ভয়। যাকে চিনি না জানি না, তার প্রতি অসীম ভয় মানুষকে ছোট করে দিল।

কিংবা, বকশী চিন্তাখিন্ন অবস্থায় বজরায় ফিরতে ফিরতে ভাবলেন আবার: যুগযুগকার অনিশ্চয় ভাগ্যের পরিহাস। জীবনধারণের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না, ছিল না স্থায়ী কোনো প্রত্যয়। দূর দেশ থেকে মারাঠারা শাসনের নামে প্রহসন করেছে। মারাঠা-প্রতিনিধি যত নিজের স্বার্থ দেখেছে, তার চেয়ে কম দেখেছে প্রজাদের শুভাশুভ। মারাঠা শাসনের ইতিহাস এ রাজ্যে দস্যুতার ইতিহাস। রাজকোষে অর্থের অকুলান হলেই সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে। অন্যায় জবরদস্তি অত্যাচারে দিনরাতগুলি কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। সুবিচার পায়নি, ন্যায়নীতি বিসর্জিত হয়েছে। এই

অনিশ্চয়ের ফাঁকে বেনোজলের মতো গোরারা সহজে এদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কোনো প্রতিবাদ নয়, কোনো হস্তক্ষেপ নয়।

বকশী যেন খতিয়ান নিতে বসেছেন। ইংরেজ এদেশে পদার্পণ করেই কত দুঃসাহসিক কাজই না করে বসল। জগন্নাথ মন্দিরের ওপর কর্তৃত্ব, তীর্থযাত্রীদের ওপর কর। নতুন করে রাজস্বের বিলি ব্যবস্থা। লবণের একচেটিয়া বাণিজ্য। করমকুব পাইকদের ওপর করের বোঝা। কড়ির বদলে রুপিয়ায় খাজনা নেবার রেওয়াজ।

এর সবগুলিই এদেশের ইতিহাসে অভিনব। এবং এগুলি ওরা কখনো জোর করে কখনো বিনা প্রতিবাদেই এখানে চালু করে দিয়েছে।

অন্য সরকারের মতো প্রথম দিকে এদেশের মানুষগুলো নতুন শাসনের প্রতি উদাসীন ছিল। অনিশ্চয়তার হাত থেকে তারা একটা শক্ত ডাঙা পেতে চাইছিল। পেলও। নতুন সরকার, নতুন জমানা। নয়া কানুন। তারপর একদিন ওরা চোখ থেকে ঘুমের কুয়াশা মুছে ফেলে দেখল এ কোথায় এসেছে। জগন্নাথের রথের থেকেও নিষ্ঠুর প্রাণহীন এক চাকা ঘর্ঘর শব্দে তাদের জীবন বোধ গুলিকে থেঁতলে চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল। পরিবর্তে তারা নতুন কিছু পেল না। অমানুষিক ক্ষুধা, বেকারী, মৃত্যু।

বকশী বেশ বুঝতে পারছেন: এই বিদেশী সরকার দেশের মানুষের দিকে চেয়ে কোনো কিছু ঠিক করবে না। তাদের নীতির ধারণা অনুযায়ী কাজ করে যাবে। সরকার গোরাদের হাতে, তাদের সাহায্যকারী রয়েছে দেওয়ান-গোমস্তা-আমলা-তহশিলদার। সরকারী কাজের জন্যে জানা দরকার ইংরেজী, ফার্সী কিংবা বাঙলা। এদেশের লোক শিক্ষায় অগ্রসর নয়, লোহার কলমে তারা লিখতে পারে না। ফলে সরকারী চাকরির জন্যে শিক্ষিতরা ছুটে এল এদেশে। বিশেষ করে বাঙলাদেশের মানুষ। সেরেস্তায় বাঙালী,

বড় বড় চাকরিতে বাঙালী। কে বলতে পারে এই বাঙালী সেরেস্তাদারদের মর্জিমতো সরকারও চলছে না!

দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ এই মুহূর্তে বকশীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর তাঁর মূর্খ ভ্রাতা তহশিলদার গৌরহরি।

বকশী বজরায় এসে উঠলেন।

অন্ধকার। অন্ধকারটা আবার বন্য বরাহের রূপ নিয়েছে। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে।

গোটা রাজ্যটা বদলে যাচ্ছে। অতি জলদে এই পরিবর্তন। হয়তো এই ভালো। যত শীঘ্রগতিতে পট পরিবর্তন হয় ভাবনা চিন্তার অবকাশ থাকে না। ইংরেজ এই কৌশল বুঝতে পেরেছে। ওদের সমস্ত কিছুর মধ্যে গতি। এবং গতিই তাদের কাছে জীবন।

বকশী নিজের ভেতরে হাহাকার বোধ করলেন। প্রচণ্ড একাকিত্ব। এবং শক্তিহীন একটা স্পর্ধা রক্তের মধ্যে মাথা ঝাপটাতে লাগল।

চিল্‌কায় আর এক মুহূর্তও ভালো লাগে না। কিন্তু পার্বতীর জন্যে থাকতে হয়। ওর সব কিছুতেই আনন্দ। আকাশ-পাখি-জল-অরণ্য।

অন্ধকারে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে পাইকদের ছেঁড়া ছেঁড়া বসতি। মানুষগুলোও প্রেত হয়ে গেছে। ক্ষুধা। কোথাও কী কোনো কান্নার শব্দ পাচ্ছেন তিনি? নাঃ গাছের মর্মর, জলের ছলছল।

বকশী চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

নয়

'আসুন, আসুন বাবু গৌরহরি—' বকশী অভ্যর্থনা করলেন: 'তারপর বহুদিন আপনার দর্শন মেলেনি। কুশল তো?'

'আপনি ভীষণ পরিহাস করেন বকশী—'

'পরিহাস!' বকশী হোহো করে হাসলেন: 'রাজপুরুষের দর্শন চিরকালই ভাগ্যের কথা। তা বলুন, কেমন আছেন? খাজনাপত্তর আদায় কেমন হচ্ছে?'

গৌরহরি বললে, 'সে-খবর আপনার চেয়ে আর কে বেশি জানে।'

বকশী বললেন, 'কী রকম?'

'খাজনা না-দেয়াটাই ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। সে-অভ্যেস ভাঙতে কম মেহনত নয়। এই তো সেদিন আমার এক আমিনকে ওরা চার ঘণ্টা আটকে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত সিপাই পাঠাতে হল, ব্যাটাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এই সব হুজ্জোত তো কম-নয়। বলুন দিকি এসব নারকীয় কাজ ভালো লাগে?'

'তো করেন কেন?'

'কী করি? চাকরি যে। ওপরঅলা ঠেলা দিচ্ছে খাজাঞ্চিখানায় টাকা পাঠাতে হবে। তহশিলের টাকা না পাঠালে আমার তো চাকরি খতম।'

বকশী হেসে বললেন, 'এত টাকা লাগে কিসে?'

গৌরহরি হাসল। বললে, 'আমার দাদাকে বলবেন একথা। টাকা ছাড়া নাকি মানুষ মুহূর্তও বাঁচতে পারে না। চুপি চুপি বলি আপনাকে কথাটা। সিপাহীদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ, ওরা আরও বেশি লুটেপুটে নিতে চায়। পুলিসের সঙ্গে অষ্টপ্রহর ক্ষমতা নিয়ে

লড়াই চলছে। ভাবখানা এই যেহেতু ওরা দেশটা জয় করেছে ভোগের অধিকারও তাদের। সরকার পর্যন্ত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সিপাহীদের ওপর নির্ভরতা ছাড়তে পারছে না কিনা। এই তো সেদিন এক সিপাহী পুলিসের মাথা ফাটিয়ে দিলে।'

বকশী বললেন, 'বলেন কী। এত খবর তো আমি জানিনে।'

গৌরহরি বললে, 'আমিও কী জানতাম। কানে এসে যায়।'

'কানে আর কী এসেছে বলুন?'

'না। বিশেষ কিছু নয়। শুনেছি ওপরতলাতেও এ নিয়ে জোর আলোচনা চলেছে। সিপাহীদের এধরনের জুলুম শাসন কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে দেখছেন না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো জানিয়ে দিয়েছেন এইভাবে দেশে সুষ্ঠু শাসন চালানো যায় না।'

'তবে সিপাহীদের সরিয়ে দিচ্ছে না কেন?'

'দেবে কি করে? দিয়েছিল তো। মহারাজা বিদ্রোহ করলেন। আবার ফিরিয়ে আনতে হল সৈন্যদের। হাতি পোষার খরচ। কেউ বলছেন পাঠিয়ে দাও, আবার কেউ কোনো বিপদের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। কাজেই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা।'

বকশী হেসে বললেন, 'আপনার কী মনে হয় এদেশের মানুষ আবার কোনোদিন বিদ্রোহ করবে?'

গৌরহরি বললে, 'কী করে বলি বলুন।'

বকশী চুপ করে রইলেন।

গৌরহরি আবার বললে, 'সরকার খাসমহলগুলির ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা করছেন। এগুলি আর নিজের হাতে রাখবেন না। উপযুক্ত লোক দেখে বিলি বন্দোবস্ত করে দেবেন।'

বকশী বললেন, 'তাই নাকি?'

গৌরহরি বললে, 'হ্যাঁ। এমনিতে খরচাপাতি আছে তো? তার চেয়ে খাজনার বন্দোবস্ত করে দিতে পারলে অনেক দায় কমে।

আমাদের বাঙলাদেশে তো অনেক আগেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়ে গেছে। লর্ড কর্নওয়ালিশ এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।'

বকশী বললেন, 'ব্যাপারটা বুঝতে চাই।'

'মানে সম্বৎসরে সরকারকে নির্দিষ্ট খাজনা দেয়ার বদলে গজিয়ে উঠল নতুন জমিদারশ্রেণী। জমির ওপর অধিকার রইল জমিদারের, সরকার শুধু তার টাকা পেয়েই খালাস।'

বকশী বললেন, 'বটে, অনেকটা আমারি মতো অবস্থা।'

'অনেকটা তাই। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী।'

'আপনার কী মনে হয় সরকার এদেশেও জমিদারি প্রথা চালু করতে চান?'

'আমার তো তাই মনে হয়। অন্তত ওদের যা নীতি।'

বকশী বললেন, 'হয়তো ভূম্যধিকারীর এতে নিরাপত্তাবোধ জন্মাবে। আপনার কী মনে হয়?'

গৌরহরি বললে, 'আমাদের দেশে তো ব্যবস্থাটা ভালোই চলছে। জমিদারও নিশ্চিন্ত, রায়তও নিশ্চিন্ত। জমির কল্যাণও হচ্ছে এতে করে।'

বকশী বললেন, 'জমিদার যদি ভালো হোন্ প্রজাদেরও মঙ্গল।'

'সে কথা তো সত্যি। জমির এই পাকা ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশে বেশ উন্নতিই দেখা যাচ্ছে। জমিদারকে কেন্দ্র করে একেকটি আদর্শ গ্রাম গড়ে উঠছে। গ্রামে টোল আছে মক্তব আছে, নাট্যমন্দির আছে। সপ্তাহে ত্বদিন হাট বসে। বারো মাসে তেরো পার্বণ। বড় বড় উৎসবের ভার নেন জমিদার, খরচপাতিও তাঁর। সেই উৎসবে পল্লীর সমস্ত মানুষের নিমন্ত্রণ। নাপিত-কুমোর-তাঁতী কেউই বাদ যায়না। জমিদার বাড়িতে রোজ পাতা পড়ছে, সকলে খাচ্ছে। গানবাজনারও অভাব নেই। সমস্ত পল্লীকে মনে হয় এক একান্নবর্তী পরিবার। আসুন না একবার আমাদের দেশে?' গৌরহরি হেসে বললে।

বকশী বললেন, 'দেখা যাক।'

'হ্যাঁ। আসুন।' গৌরহরি উঠে পড়ল: 'ভালো কথা, দাদা আসছেন দু একদিনের মধ্যে।'

'তাই নাকি? চিঠি লিখেছেন?'

'হ্যাঁ। একবার ঘুরে যাবার ইচ্ছে। মানে আমার কাজকর্ম কী রকম হচ্ছে তদারক করে যেতে চান।' গৌরহরি হাসল: 'আমাকে নিয়ে দাদার ভারি ভয়। আমি মূর্খ কিনা।'

বকশী হাসলেন।

'তা দেখছেন তো আমার ঘরবাড়ির অবস্থা। দাদা যদি আপনার প্রাসাদে এসে ওঠেন বেঁচে যাই।'

বকশী বললেন, 'তাঁকে আমি রাজি করাব। আমার এখানে অনেকদিনই তাঁর আতিথ্য গ্রহণের কথা।'

গৌরহরি বিদায় নেবার পর বকশী ঘোড়ায় চড়ে বেরুলেন বাড়ি থেকে। ঠিক বাড়ির সামনে সেই লোকটা! বকশী কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছেন ওই লোকটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর গতিবিধি অনুসরণ করে। লোকটা কী গুপ্তচর! তাঁর চলাফেরা লক্ষ্য করবার জন্যে তাকে রাখা হয়েছে।

বকশী ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে এগোলেন।

সামনে একটা বাঁক।

বকশী ঝট করে মোড় ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

চোয়াল দুটো নড়ছে। চোখে দাহ।

লোকটা চোরের মতো মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করামাত্র সপাং করে পিঠে এক চাবুকের ঘা। আর, যেমন করে বোঝা তুলে নেয় সেইভাবে বকশী লোকটাকে হিঁচড়ে ঘোড়ায় টেনে তুললেন। ঘোড়া ছুটে চলল। নক্ষত্রগতিতে ঘোড়া ছুটেছে। বসতি পেরিয়ে ঘন জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের ঘেরায় এখন এই স্থানটি নির্জন।

বকশী ঘোড়া থেকে লোকটাকে নিচে ছুঁড়ে দিলেন। লোকটা সেই অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করছিল। বকশী বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। সপাং সপাং। চাবুকের শব্দ। লোকটা গড়িয়ে পড়েছে পথের ধুলোয়। রক্তে-কাদায় ওকে এখন নোঙরা দেখাচ্ছে। নরকের মতো নোঙরা।

'কী নাম তোর উল্লু?' বকশীর কপাটের মতো বিশাল বুক দর দর করে ঘামছে। কপালের সিঁদুরের ফোঁটা গলে গলে পড়ছে।

'চরণ, চরণ পটনায়ক—' লোকটা হিহি করে কাঁপছিল, কাঁদছিল।

বকশীর অন্তঃকরণ প্রচণ্ড নিদাঘে ধু ধু প্রান্তরের মতো জ্বলছিল। ধোঁয়া-ধোঁয়া বাষ্পের মতন দিগন্ত কাঁপছিল। বকশী সারা শরীরে জ্বালা বোধ করছিলেন, চোখের মণিদুটো ঘূর্ণায়মান, তীক্ষ্ণ তীব্র পিপাসায় খাঁ খাঁ করছিল সমস্ত চৈতন্য।

'নেমকহারাম কুত্তা বেজন্মা কাঁহাকা – কত টাকা পেয়েছিস নতুন মুনিবের কাছে? নেমকহারামির দাম? এখন যদি পা দিয়ে থেঁতলে দিই তোর কলিজাটাকে?'

'দেবতা, কৃপা—'

'কৃপা। তোর মতো একটা কুত্তাকে? তোর নাম চরণ, চরণ শরীরের কোথায় থাকে? নিচে। সে যদি মাথায় উঠতে চায় তাহলে—' সপাং করে চাবুকের শব্দ।

লোকটা গোঙাচ্ছে, সরীসৃপের মতো পাকিয়ে যাচ্ছে। ধুলো কাদায় তাকে ইতর প্রাণীর মতো দেখাচ্ছে।

'দেবতা, কৃপা—' ভয়ে-যন্ত্রণায় লোকটা কোঁকাচ্ছে।

বকশী পাথরের মতন দাঁড়িয়ে। দেখছেন ওই ভয়ের চেহারা-টাকে। প্রকাণ্ড আকাশের নিচে বীভৎস উলঙ্গ দেখাচ্ছে লোকটাকে। ভয়! বকশী ভাবলেন: এ কী মৃত্যুর ভয় অথবা জীবনধারণের! কিংবা মানুষটা আগেই মরে গেছে, অনেকদিন

আগে। আর, মৃত মানুষের আকৃতি এমন অসহায়, এমন নির্লজ্জ। হঠাৎ সমস্ত দেশের জন্যে মাতৃহীন বেদনা বোধ করলেন তিনি। অনাথ নিঃসহায় বেওয়ারিশ জন্তুর মতন সারা দেশটা কাতরাচ্ছে। একটা অনাথ শিশুর চিত্রও কল্পনায় আনলেন বকশী। কালো কালো, হাড় জিরজিরে, চোখে পিঁচুটি, মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। এবং নগ্ন। তাঁর দেশ! চারদিকে মৃত্যুর মিছিল, মৃত্যু। ভয়ের। জীবন ধারণের। যদি, যদি এই ভয়ের যবনিকাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারতেন।

'মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ' বেইমান—'বকশী চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকারটা গড়াতে-গড়াতে কাঁপতে-কাঁপতে দূরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল। সমগ্র পরিবেশ যেন চিৎকার করে উঠল: প্রস্তুর হ' প্রস্তুত হ'।

'দেবতা, কৃপা—'

বকশী গর্জালেন: 'উঠে দাঁড়া উল্লু—'

লোকটা কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

বকশী বললেন, 'তুই মরে গেছিস, তুই আর বেঁচে নেই—শোন, আজই এখুনি এই রাজ্য থেকে চলে যাবি। আর কোনোদিন কেউ যেন তোর মুখ এখানে দেখতে না পায়। যা ভাগ—ভাগ বেজন্মা—'

লোকটা দৌড়চ্ছে। টলছে। কয়েকবার হোঁচট খেল। আবার উঠল। ছুটছে। ওরা খর্ব ছায়া টিলার ওপর নাচতে নাচতে চলেছে। লোকটা ক্রমশ বিন্দুর মতো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—হারিয়ে গেল দিগন্তে।

বকশী ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরলেন।

কী একটা কাজ করার ছিল, ভুল হয়ে গেছে। বকশী মনে করতে পারছেন না। শরীরে অপরিচ্ছন্ন অবসাদ। নাঃ রোড়াং-এ এখন যাবেন না। বাড়ির দিকে ফিরলেন তিনি।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বকশী নিজের মনেই বললেন : কালেকৃট্রিতে খাজনা পাঠাতে হবে। এই সপ্তাহেই পাঠাতে হবে।

বাড়িতে পা দিয়ে খবর পেলেন, তাঁর প্রধান সিরদার এসেছেন।

মণ্ডপগৃহে এসে বসলেন বকশী।

'এই যে কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধর, খবর কী?'

কৃষ্ণচন্দ্র নমস্কার করলেন। 'খবর ভালো।'

'সারা রাজ্যেরই খবর ভালো, তাই না? মানুষ বেঁচে আছে, না মরে গেছে?'

'প্রভু, মানুষ একবারই মরে।' কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন।

'বড় ভালো কথা বলেছ!' বকশী বললেন : 'তোমার কথায় মনে জোর আসে।' বকশীকে চিন্তামগ্ন দেখাল : 'তুমি বেশি এসো না আমার এখানে। যত দূরে দূরে থাকো ততই মঙ্গল। গভর্মেণ্ট আমার ওপর নজর রাখছে।'

'কী বলছেন, প্রভু?'

'হ্যাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র। দিনকাল বড় খারাপ। এই তো আজই এক চরকে আচ্ছা করে চাবকালাম।'

'কী নাম লোকটার?'

'চরণ পটনায়ক।'

'তা প্রভু, শেষ করে দিলেন না কেন?'

'উচিত ছিল। পারিনি। হয়তো এ রাজ্যে আর সে ফিরবে না। তবে যেখানেই থাক গুপ্তচরের কাজ সে করবেই। বেঁচে থাকার ব্যাপারে বড় ভয় পেয়েছে কিনা। নামটা মনে রেখো। চরণ পটনায়ক। দরকার হলে শেষ করে দিতে হবে।'

'তা আর বলতে, প্রভু।'

'তারপর—তুমি কোথায় কোথায় ঘুরলে?'

'অনেক জায়গায় গেছি। গুমসুর, বানপুর, পিপলি, পুরী, লিম্‌বাই, কোটডেস, গোপ, আরও অনেক জায়গায়।'

'কুজান, কনিকায় যাওনি?'

'গিয়েছি, প্রভু।'

'কুজানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। রাজার দুই সিরদার—নারায়ণ পরমগুরু বামাদেব পট-যোশী ওঁদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে।'

'কী রকম বুঝছ?'

'অবস্থা তো ভালোই মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা।' বকশী নিশ্বাস ফেলে বললেন। 'তুমি স্নানাহারাদি সেরে বিশ্রাম করো। আমি ভিতর মহলে যাচ্ছি।'

রাস্তা থেকে একটা উৎকট কোলাহলে মণ্ডপগৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধর। দূরের থেকে কিছু বুঝতে পারলেন না। দেখলেন, কোনো একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে একটা রসালো ভিড় জমেছে। বস্তুটি ছুটছে। নাঃ কোনো জন্তু-জানোয়ার নয়। কৃষ্ণচন্দ্র বিস্মিত হয়ে দেখলেন একটি উলঙ্গ নারীমূর্তি—ধূলিধূসর, শক্ত সমর্থ যুবতী-শরীর। নগ্নতাকে স্বপ্রকাশ করে পাথরে-কুঁদা জঙ্ঘাদেশ, নিতম্ব, সুপুষ্ট স্তন। বোধহয় পাইকদের মেয়ে। আরো আশ্চর্য হলেন—মেয়েটির মাথা কামানো, সন্ন্যাসীর মতন। কয়েকজন সিপাহী মজা করছে তার সঙ্গে। মেয়েটি ছুটছে, ধুলোয় লুটিয়ে পড়ছে, আবার উঠছে। মুখে করে থুতু ছিটোচ্ছে। কৃষ্ণচন্দ্র দেখলেন মেয়েটাকে। চোখের তারা ঘুরছে, আপনমনে বিড়বিড় করে কী বলছে। মেয়েটি কী উন্মাদ!

হল্লার শব্দে বকশীও কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কী ব্যাপার, কৃষ্ণচন্দ্র?'

'কিছু বুঝতে পারছিনে, প্রভু। একটি উলঙ্গ যুবতী, মাথা কামানো—'

বকশী বললেন, 'ছিঃ ছিঃ! একটা কাজ করো কৃষ্ণচন্দ্র। মেয়েটিকে আমার এখানে নিয়ে এসো। এ যে সমস্ত রাজ্যের অপমান!

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'প্রভু—'

বকশী কঠিন গলায় বললেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র, ভুলে যেও না আমি বকশী জগবন্ধু, তোমাকে আদেশ করছি।'

কৃষ্ণচন্দ্র দ্বিধা না করে বেরিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মেয়েটিকে নিয়ে এলেন। মেয়েটি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে ধুলোকাদায় তাকে এখন জানোয়ার ভাবা অসম্ভব নয়। ক্ষুর দিয়ে বিশ্রী করে কামানো ওকে কুৎসিত দেখাচ্ছে। যৌবনের ঐশ্বর্যগুলি ছিন্ন পতাকার মতো সে যেন বহন করে নিয়ে এসেছে।

বকশী হাঁকলেন: 'কে আছিস?'

ভৃত্য ছুটে এল।

'একে ভেতরে নিয়ে যা। দাসীকে বলবি একে স্নান করিয়ে উত্তম বস্ত্র পরিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা করে শয়নের তত্ত্বাবধান করে।'

ভৃত্য মেয়েটিকে নিয়ে অন্তর্হিত হল।

বকশীর আননে চিন্তার ঘন মেঘ। কী ভাবছেন তিনি, নিজেই বুঝতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে একজোড়া মুখ ভেসে উঠল—যুগল প্রেমিকের। তাদের একদিন ঘোড়ায় করে পলায়নের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি: মনে পড়ছে। আশ্চর্য, এই মেয়েটির মুখ যেন তাঁর চেনা। হ্যাঁ, ঠিক। বকশী নিশ্বাস ফেললেন।

'প্রভু!'

'এই মেয়েটিকে আমি চিনি।'

'প্রভু—'

'এর নাম নুরান। একটি যুবককে সে ভালোবাসত—তার নাম দীপ। ওদের বিয়েতে আত্মীয়স্বজনের আপত্তি ছিল। আমিই ওদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করি। যতদূর জানি ওরা পুরীতে গিয়ে সংসার পেতেছিল।'

'প্রভু'—

'হ্যাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র। আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিনে—ওর এই দশা কী করে হল।'

'প্রভু, দিনকাল বড় খারাপ হয়ে পড়ছে।'

বকশী মৌন হয়ে রইলেন।

সন্ধ্যার ম্লান আলো নেমে এসেছে।

স্তিমিত বাতিদান জ্বলছে। বকশী বসে আছেন। আর তার পায়ের নিচে অশ্রুমুখী নুরান। তার জীবনের গ্রন্থি খুলে ধরেছে। বকশী স্তব্ধ নয়নে শুনলেন ওর কাহিনী। নির্মম অত্যাচারের ক্লেদ আর গ্লানির বৃত্তান্ত।

'কিন্তু দীপ, দীপের কী হল?'

'জানিনে গো। ও তো ভয় পেয়ে পালিয়েছে।'

'ওর সহিসের চাকরি?'

'সাহেব ছাড়িয়ে দেছে।' নুরান কাঁদতে কাঁদতে বললেঃ 'ও সাহেবের কাছে দরবার করেছিল তো কেউ শুনল না। উলটে আমাকেই ওরা মন্দ বললে। ওরা সাহেব লোক ওরা অন্যেয় কাজ করতে পারে না। আর, আমি নাকি আয়া আমার ইজ্জত নাই। তো মেজর সাহেব আমার মুনিব, আমার ইজ্জত নিলে। তারপর আমাকে ফেলে দিয়ে এল সাগরের কিনারে। সারা রাত পড়ে রইনু। সকালে বাড়ি গিয়ে দীপকে সব বলনু। ও গেল ওর মুনিবের কাছে। নালিশ করতে তো বিচার বসলেক। সিপাহীদের বিচার। আমাকে বললেক ওরা মিথ্যাবাদী, আমাকে ওরা সাজা দিলে। খোলা রাস্তায় আমার মাথা মুড়িয়ে বাদ্য বাজিয়ে আমাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিলে জগন্নাথ ধাম থেকে। বলো দেবতা কোন পাপে আমার শাস্তি?'

বকশী চুপ করে রইলেন। অন্ধকার নামছে। জমাট গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারটা বন্য বরাহের আকার নিচ্ছে। গুঁড়ি মেরে

এগিয়ে আসছে। তাঁর রক্ত কী হিম হয়ে গেছে? বকশী ভাবলেন। তাঁর দেশ, স্বদেশ – বকশী মনে মনে উচ্চারণ করলেন। একটা নিরন্ধ্র শূন্যতা বকশীকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে। লোকে বলে তিনি পিঠ দিয়ে একটা মস্ত পাথরকে উঁচুতে তুলে দিয়েছিলেন! বকশী এই জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করলেন এখন। যেন আজন্ম তিনি একটা পাথরকে ঠেলে তুলছেন যে-পাথরটা সর্বদা তাঁর পিছনে রয়েছে।

বকশী পায়ের তলায় লুটিয়ে-পড়া মেয়েটার দিকে চোখ রাখলেন। সহসা তিনি একটি সত্য খুঁজে পেলেন। নাঃ আর পুরুষ-দেবতায় চলবে না। নতুন দেবতা চাই। নয়া জমানা নয়া শক্তি। যে-দেবতা উৎপাদনের যন্ত্র, সৃজনক্ষম। স্ত্রী-দেবতা চাই। এই বন্ধ্যা জমিকে সৃষ্টির ঐশ্বর্যে ভরে তুলতে হবে।

তারপর রাত্রি নামল। কালো থমথমে রাত্রি।

আর, রাত্রির অবগুণ্ঠনে আবৃত নিঃশব্দ পায়ে পিলপিল করে বকশীর মণ্ডপগৃহের সামনে পাইকরা এসে জমায়েত হল। ওরা খবর পেয়েছে নুরানের, তার অত্যাচারের। বকশী অন্ধকারে দেখলেন পাথরের মতন মানুষগুলোকে। বিশাল বুক, চওড়া কাঁধ, কঠিন কবজি। চোখগুলোতে যেন হাজারো মশাল ধিকি ধিকি করে জ্বলছে।

বকশী দিশেহারা হয়ে গেলেন এই উদ্বেল জনসমুদ্রের সামনে।

'পিতিবিধান চাই দেবতা, পিতিকার চাই—'

বকশী চিৎকার করতে চাইলেন: 'তোরা চলে যা। আমি কেউ নই।' স্বর বেরুল না।

বকশী দেখলেন ওরা নুরানকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। যেন চূড়ার মত বহন করে নিয়েছে ওকে। যেন বলতে চায়: ওর ভার ওরাই বহন করবে।

ওরা চলে গেলেও বকশী দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর কোনোদিন নড়বেন না তাঁর স্থান থেকে।

দশ

অবশেষে দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের পদার্পণ ঘটল খুরদা রাজ্যে। বকশীর এতদিনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন তিনি। মহামান্য অতিথি-সেবায় কোনো ত্রুটি রইল না। কৃষ্ণচন্দ্র যে শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছেন তাই নয়। এখানকার খাসমহলগুলি সরকার যোগ্য লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবেন, এ-সংবাদ জানা ছিল। তাই সরেজমিনে মহলগুলি দেখারও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। কটকে যখন পাকাপাকি থাকতেই হচ্ছে নিজস্ব কিছু জমি বাড়ানো দরকার।

কয়েকদিন মহলগুলি দেখে এলেন কৃষ্ণচন্দ্র। কোনোদিন বকশীর সঙ্গে, কোনোদিন গৌরহরির সঙ্গে। রাহাং, চৌবিশকুদ, সারাইন। এবং রাহাং-এর পাশে বকশীর মহল রোড়াং-ও দেখলেন তিনি। দেখলেন আর মুগ্ধ হলেন। এখানকার জমি এত উর্বর যে লোভ জাগে।

গৌরহরির কাজকর্মেরও তদারক করলেন। উপদেশ দিলেন।

সেদিন হাসতে হাসতে বকশীকে বললেন, 'এ রাজ্য ছেড়ে যেতেই ইচ্ছে করে না বকশী।'

বকশীও হাসলেন। 'থেকে যান।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'সত্যি এখানকার মাটির যেন আকর্ষণ আছে।'

বকশীও বললেন, 'সরকারকে বলে খাসমহলগুলি নিয়ে নিন না।'

'তেমন ইচ্ছে আছে। দেখা যাক ভগবান কী করেন।'

'আপনি ভগবানকে খুব বিশ্বাস করেন দেখছি।'

'বিশ্বাস তো কিছু করতেই হবে বকশী। সবই তাঁর ইচ্ছা।'

বকশী হাসলেন, 'গোরারা কিন্তু এসব কিছুই বিশ্বাস করে না।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'করে, করে। বিশ্বাস না -করে উপায় নেই। ভালো কথা, আপনাকে আসল খবরই দেয়া হয়নি। দেখছেন তো বয়েস হলে স্মৃতি নষ্ট হয়। আপনাদের মহারাজার কথা বলছি। কটক দুর্গ থেকে তিনি মুক্তি পাচ্ছেন।'

'তাই নাকি? কবে?'

'দু-একদিনের মধ্যেই। তাঁকে পুরীতে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেমন, সুখবর নয়?'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ইংরেজদের হৃদয় বলে একটি বস্তু আছে। হাজার হোক রাজার জাত। বিদ্রোহীকে ক্ষমা করা সহজ নয়। এ যে কত বড় মনের ঔদার্যের পরিচয়— আমরা বাঙালীরা সকলের আগে ওদের এই হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছি, তাই আমরাই মনেপ্রাণে ওদের অভিনন্দন জানাতে পেরেছি।'

'বাঙালী বুদ্ধিমান জাতি।'

'দেখবেন ক্রমশ ওদের বুদ্ধির পরিচয়। আমি বলছি বাঙালী ভারতের সব জাতির থেকে এগিয়ে যাবে। ওরাই সমস্ত দেশকে নেতৃত্ব দেবে।'

'সে তো এখুনি দেখতে পাচ্ছি।' বকশী বললেন। 'দলে দলে বুদ্ধিমান বাঙালীরা উড়িষ্যায় ছড়িয়ে পড়ছেন। আপনাদের ছাড়া গোরা রাজত্ব একদিনও চলবে না।'

'আপনাকে রামমোহন রায়ের কথা কী বলেছিলাম? রামমোহন নিজেই একটি যুগ, এমন যুগস্রষ্টা মহামানব সারা ভারতে দুটো পাওয়া যাবে না। এখন তিনি রংপুরে কালেক্টার ডিগবী সাহেবের মুনশী। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী তো বটেই, তাঁর মতো ইংরিজিনবিশ লোক আর দুটো নেই। বাঙালীর যে এত উন্নতি, তা তার ইংরেজি ভাষা আয়ত্তের গুণে। আর, রামমোহনই প্রথম এই ইংরেজী চর্চার পক্ষে সারা দেশকে মাতিয়ে তুললেন।

ভেবে দেখুন দিকি আমরা যদি ইংরেজী ভাষা বর্জন করতাম তাহলে কী এত অগ্রসর হতে পারতাম।'

বকশী হাসলেন। 'আপনি ইংরাজ রাজত্বের ঘোরতর সমর্থক!'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'আমি সমর্থন না-করলেও ইংরাজ আসত। না হয় ফরাসী আসত। ইংরাজ রাজত্বে মশায় শান্তিতে বাঁচছি।'

বকশী চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি কী এবার জগন্নাথধাম ঘুরে আসবেন?'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'না। শরীরটা তেমন ভালো নেই। কটকে ফিরে যাব।'

'আমাকে যেতে হচ্ছে। কালেকট্রিতে খাজনাটা দিয়ে আসতে হবে।'

'কী দরকার কষ্ট করার?' কৃষ্ণচন্দ্র পরামর্শ দিলেন: 'গৌরহরিকেই তো দিতে পারেন। ও যখন সরকারি তহশীলদার রয়েছেই।'

'সেটা কী সুবিধে হবে? এতদিন নিজেই দিয়ে আসছি।'

'অসুবিধে কোথায়? সে তো আপনার নামে জমা করে নেবে।'

'বলছেন?' বকশীকে চিন্তিত দেখাল: 'আমি তো আবার আইনপত্র ভালো বুঝিনে।'

কৃষ্ণচন্দ্র হাত নেড়ে বললেন, 'আইনে আটকাবে না।'

'তাহলে গৌরহরিকেই দিয়ে দেবো।'

'হ্যাঁ। তাই করুন।' কৃষ্ণচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি একবার গৌরহরির কাছ থেকে ঘুরে আসি।'

'পালকি দেবো।'

'না না। পদযানেই যাব।'

কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তা করতে করতে এগোচ্ছিলেন। খাসমহলগুলির বন্দোবস্ত তিনিই নেবেন। কী যেন পরগনাগুলির নাম! রাহাং, চৌবিশকুদ, সারাইন। রোড়াং! কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন: না ওটা বকশীর সম্পত্তি। রাহাং—রোড়াং, কী ছন্দময় নাম এবং দুটোই

পাশাপাশি গলাগলি দাঁড়িয়ে আছে। রাহাং—রোড়াং, যেন মুখস্থ করছেন কৃষ্ণচন্দ্র।

'গৌরহরি আছিস নাকি?'

'দাদা। আসুন।'

গৌরহরি কৃষ্ণচন্দ্রকে বসবার আসন দিল।

'আমি কাল চলে যাচ্ছি। তোর বউঠাকুরুনের ইচ্ছে, অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি।'

'দাদা, আপনি আমাকে আদেশ করছেন?'

দিন কতক-না হয় ঘুরেই এলি। অসুবিধে কিছু নেই তো?'

'না। অসুবিধে কিসের।'

গৌরহরি দাদাকে চেনে। হঠাৎ দাদার এই খাতির করে কটকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, কে বলতে পারে। গৌরহরি শঙ্কিত হল।

'তারপর হিসেব-নিকেশের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? কাগজপত্তর কায়দামতো রাখা এই আর কী।' কৃষ্ণচন্দ্র বললেন: 'হ্যাঁ। বকশীর সঙ্গে কথা হল। আমার অনেক পরিচিত লোক। ওকে দেখাশোনা করা আমাদের কর্তব্য, তাই নয় কী? কালেক্‌ট্রিতে খাজনা জমা দেবার জন্য পুরীতে যাবেন বলছিলেন। আমিই বারণ করলাম। গৌরহরি থাকতে, তাঁর অত কষ্ট করার কী দরকার। এবার থেকে ওর খাজনা তিনি তোর কাছেই দেবেন। তুই জমা করে নিবি।'

গৌরহরি বিস্ময় বোধ করল: 'আমি তো খাসমহলের তহশিল-দার। ওঁর খাজনা জমা নেবার তো আমার এক্তিয়ার নেই।'

কৃষ্ণচন্দ্র মোলায়েম হাসলেন। 'তুই এখনো তেমনি আছিস। কেন, তুই তো সরকারী লোক বটে। একজনের যদি সুবিধে হয়, সেটা করতে তোর এত আপত্তি কেন। এ তো আর কোন অসাধু ব্যাপার হচ্ছে না।'

গেরহরি বললে, 'না, তা নয়। তিনি এতদিন নিজেই কালেক্-টরের কাছে জমা দিচ্ছিলেন কিনা, তাই বলছিলাম—'

'সে একই কথা।' কৃষ্ণচন্দ্র বললেন। 'শোন—এই খাসমহল-গুলির জমিদারী আমিই কিনে নেবো। তবে আপাতত স্বনামে নয়। লক্ষ্মীনারায়ণ আমার হাতের লোক। তাকেই খাড়া করে দেবো।'

গৌরহরি বললে, 'সে আপনি যা ভালো বোঝেন।'

'যা ভালো বুঝি তাই তো করছি।' কৃষ্ণচন্দ্র পিতামহ ব্রহ্মার মতো হাসলেন: 'দেখি কাগজপত্রগুলো। যেমন যেমন বলেছি, সেইভাবে রাখছিস তো? কী জানিস গৌরহরি, খাতাপত্র ঠিক রাখাই হচ্ছে আসল জিনিস।'

গৌরহরি বিরক্তি গোপন করে খাতাপত্র দেখাতে লাগল।

অবশেষে দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র খুরদারাজ্য থেকে বিদায় নিলেন। গৌরহরিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুললেন না। এই সরল বোকা ভায়ের জন্যে উদ্বেগের অন্ত নেই তাঁর। অথচ, জমিজমার কাজ, কিছু তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকলে আখেরে কোনো লাভ হয় না। খাজনা কেবল আদায় করলেই যদি তহশিলদারের চলত, তাহলে কাজটা সহজ ছিল। যে-কেউ করতে পারে। দিন কখনো একরকম যায় না। নিজের কথাও ভাবতে হয়। সরকার এমন কিছু তোমাকে মাইনে দেয় না যে তাতেই তোমার চলবে। সরকার তো আর জমিতে আসে না! জমির দণ্ডমুণ্ড কর্তা তুমি! তাই বুদ্ধির গোড়ায় হাওয়া লাগাতে হয়। কী জানো গৌরহরি, মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। নইলে মানুষের সঙ্গে পশুর তফাত কী রইল। দাদা সাধারণভাবে জ্ঞান দিতে দিতে যখন বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন তখন গৌরহরি আঁতকে না-উঠে পারল না।

'দাদা, এ যে অন্যায়, পাপ, অকৃতজ্ঞতা!'

কৃষ্ণচন্দ্র স্থির অথচ কঠিন গলায় বললেন, 'তুই আমাকে উপদেশ দেবার চেষ্টা করছিস, মনে হচ্ছে।'

গৌরহরি মূক হয়ে রইল।

'পাপ-পুণ্য বিচারের মাপকাঠি ভগবান নিশ্চয়ই তোর হাতে দেন নি।' কৃষ্ণচন্দ্র বললেন ঃ 'সংসারে বাস করতে গেলে বিষয়ী হতে হবে গৌরহরি, যুধিষ্ঠিরের মতন লোককে পর্যন্ত মিথ্যা বলতে হয়েছে। সে কথা যদি বলিস, জমি কারুরই নয়, যেহেতু কোনো মানুষ তা সৃষ্টি করেনি। জমির ওপর যে কারুরই মালিকানা অন্যায়, পাপ।' একটু উদাসীন হেসে ঃ 'সংসারে টিকে থাকতে হলে পাপ কিছু করতেই হচ্ছে। সেটাই নিয়ম।'

গৌরহরি অতঃপর আর কিছু বলতে সাহসী হল না। কৈশোর থেকেই তার দাদার ওপর অত্যন্ত ভয়। তাই একটা দূরত্ববোধ ছিল। গৌরহরি নিজেও কিছু সৎপ্রকৃতির মানুষ নয়, তার মনের গড়ন গ্রাম্য দোষ-গুণে জড়ানো। এবং কিছু ভীতু এবং স্ত্রীসুলভ স্বার্থপর।

গৌরহরি বিমর্ষ উদ্বিগ্নতা নিয়ে খুবদা রাজ্যে ফিরে এল। এবং বকশীকে এড়িয়ে চলতে লাগল। বকশী মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করেন। এবং নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হয় গৌরহরিকে। কিন্তু বকশীর অস্তিত্বে সে নিদারুণ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। নিয়ত একটা ভার বহন করে নিঃশব্দে চলাফেরা করতে হয়। তিক্ত কৌতুক করে গৌরহরি নিজেই বলে ঃ 'শালা, এ যেন অবৈধ গর্ভ।' একদিন না একদিন এটা প্রকাশ পাবে এবং জবাবদিহি করতে হবে তাকেই।

'ধুত্তোর' বলে গৌরহরি মদ গেলে আর মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে থাকে। আসলে গৌরহরি বিষয়টাকে ভুলতে চায়। এবং যত দিন যেতে থাকে সে ভুলতে আরম্ভ করে। সময়ের ধুলিতেই

চাপা পড়ে। আর, বিবেক বলে পদার্থটির যে পীড়ন তাও ক্ষয় হয়ে হয়ে এক সময় বিলীন হয়ে যায়। দাদার দর্শনে সান্ত্বনা পায় ঃ সংসারে টিকে থাকতে হলে পাপ করতেই হচ্ছে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির ইত্যাদি।

এক শুভদিনে কৃষ্ণচন্দ্রের চিঠি এল। ব্যবস্থা সব পাকা। বেনামীতে খাসমহল আমিই কিনে নিয়েছি। আমার লোক লক্ষ্মীনারায়ণের নামেই আপাতত বন্দোবস্ত রইল। লক্ষ্মীনারায়ণ কয়েকদিনের মধ্যে গিয়ে জমিদারির দখল নেবে।

বোর্ড অব রেভিন্যু আমারি পরামর্শ মতো কিল্লা রাহাং-এর নতুন নামকরণে সম্মত হয়েছে। এখন থেকে 'রাহাং ওঘাইরা' এই নামে খাজনা জমা পড়বে। অন্যান্য মহলগুলিও একত্র এই নামে পরিচিত হবে।

আমার নির্দেশমতো নথিপত্র সেইভাবে রাখবে। বলা বাহুল্য রোড়াং কিল্লার জমা রাহাং ওঘাইরার খাতে পড়বে।

আশাকরি তোমার অনুধাবনে অসুবিধা হবে না।

চিঠি পেয়ে বাবু গৌরহরি কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর যা হয় হোক এই বলে মুখ বুজে কাজকর্ম করে চলল।

এগারো

এবার শীতের প্রারম্ভেই বকশী গুরুতর চর্মরোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। প্রাচীন দুরারোগ্য ব্যাধি। এবার আক্রমণ সর্বাঙ্গে ছেয়ে গেছে। গা থেকে চামড়া খসে পড়ছে, ঘায়ের মতো দগদগে দেখাচ্ছে সর্বশরীর। হাঁটতে পারেন না। বিছানায় পড়ে কাতরান।

এই সময় মন আরও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বকশী চারদিকে হতাশা আর মৃত্যুর ছায়া দেখেন। সব ভেঙে পড়ছে, দুষ্ট ক্ষতের মতন।

বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে একবার বাবু গৌরহরিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গৌরহরি কাজের অজুহাতে দেখা করবার সময় পায়নি।

রোগশয্যায় নিজেকে আরো অসহায় লাগে।

পুরীতে গিয়ে মহারাজাকে দেখে আসবার বড় ইচ্ছে ছিল। কতদিন দেখেননি। রাজকুমার হরিকিষণের কথাও মনে পড়ে। একেবারে শিশু দেখেছিলেন তাকে। এখন কত বড় হয়েছে, মনে মনে বয়স হিসেব করেন। পারেন না। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধরও অনেকদিন আসেনি। অবশ্য তিনিই তাঁকে ঘন ঘন আসতে বারণ করেছেন।

ক্রমশ খুরদা রাজ্য একটা জালে জড়িয়ে পড়ছে। আর সে জালের ভেতরে তিনি নিজেও বন্দী। এ-জীবনে আর বন্দীত্বের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। নিজের বাঁধনেই তিনি আটকা পড়েছেন। রোড়াং-এর মাটি। স্তনের গন্ধ। মাদকতা, উত্তেজনা। কতদিন জমিতে যাননি।

সকালের আলোয় চারদিক পরিচ্ছন্ন। সূর্য উঠেছে। জানলার

বাইরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বকশী। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা শব্দ। চমকে উঠলেন বকশী। জমাট-বাঁধা চিৎকার। চিৎকার শুনলেই আজকাল বুকের ভেতরে কেমন করে ওঠে। এবং এই দুর্বল শরীরে উত্তেজনা সহ্য হয় না।

বকশীর মনে হল কারা দৌড়ে আসছে। তাদের পায়ের শব্দ হৃৎপিণ্ডে প্রতিধ্বনি তুলছে। বকশী একটু উঠে বসলেন। শব্দটা বোঝবার চেষ্টা করছেন। যেন তাঁর গৃহের সামনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'কে ?' চিৎকার করে উঠলেন বকশী।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ভৃত্য এসে দাঁড়াল। 'ওরা খবর নিয়ে এসেছে। একদল লোক আপনার কিল্লার দখল নিতে এসেছে।'

বকশী যেন বুঝতে পারলেন না ভৃত্যের কথাগুলি। নাকি ও নেশা করেছে, দিবাস্বপ্ন দেখছে।

'কী বলছিস যা তা ? মাথা খারাপ হল তোর ?'

'আজ্ঞে না। এরা খবর নিয়ে এসেছে। ওরা কোনো বাধা মানছে না, প্রভু। ওদের সঙ্গে সরকারী কাগজপত্র আছে।'

বকশী বললেন, 'ডাক ওদের।'

উত্তেজিত জনতা এসে ঢুকল বকশীর শয়নগৃহে।

'কী রে কী হয়েছে ?'

'দেবতা, সর্বনাশ হয়েছে। একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে জমিন দখল করতে এসেছে। ও জমি নাকি ওদের।'

বকশী বললেন, 'এখনো চন্দ্র সূর্য উঠছে, দেবতা আছে। এমন অসম্ভব ব্যাপার কী করে হতে পারে? রোড়াং কিল্লা আমার। আমিই এর মালিক।'

'আমাদের লোক বাধা দিচ্ছে দেবতা, কিন্তু ওরা শুনছে না। ওরা জোরজবরদস্তি করছে।'

'আশ্চর্য!' বকশী বিশ্বাস করতে পারেন না কিছুতেই: 'বাবু গৌরহরি তহশিলদার, তিনি নেই ওখানে?'

'তিনি আছেন দেবতা। তাঁর সাক্ষাতেই তো মাপজোক হচ্ছে।'

'বাবু গৌরহরি, কী বলছিস তোরা! ও তো জানে কিল্লা রোড়াং আমার। আমার খাজনা তো সে-ই জমা নিয়েছে এতদিন। নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে। এই, কে আছিস? আমার ঘোড়া সাজা। আমি যাব—'

'আপনি এই শরীরে!'

'বেআদপ, যা আদেশ করছি, কর।'

বকশীকে ঘোড়ায় তুলে দেয়া হল। কষ্ট হচ্ছে। হোক। তারচেয়েও বড় কষ্ট বকশীর অন্তরে। তাঁর জমিন্, কিল্লা রোড়াং! তীব্র বাৎসল্য বোধ করেন বকশী।

সকালের রোদ ইলিশের আঁশের মতো ঝলসাচ্ছে।

বকশী কাতারাচ্ছেন।

দূর থেকে দেখা যায় তাঁর জমির সীমানা ঘিরে একদল লোক। হাতে লাঠি। তাঁর লোকেরাও দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদারের ভঙ্গিতে। জমিতে পরিপূর্ণ হরিদ্রাভ ফসল, রোদে ঝালরের মতো কাঁপছে।

তাঁর আবির্ভাবে বকশীর লোকেরা জয়ধ্বনি করে উঠল।

বকশী ঘোড়া থেকে কষ্টে নামলেন। অচেনা লোকগুলোকে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করলেন। বাবু গৌরহরি কোথায়! তাকে কাছে কোথাও দেখা গেল না।

বকশী গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন: 'কী ব্যাপার?'

একজন লোক এগিয়ে এল। 'আমরা জমির দখল নিতে এসেছি।'

'এর অর্থ?' বকশী প্রচণ্ড বিরক্তিতে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'অর্থ আবার কী। জমি আমাদের। দখল নিতে এসেছি।'

'না।' বকশী সিংহনাদ করে উঠলেন।

'না!'

'এ জমি আমার। আমার জননী, আমার সন্তান. আমার কন্যা, যতদিন আকাশে সূর্য থাকবে ততদিন আমারই। আর কারুর নয়।'

লোকটা বললে, 'এ জমি এখন আমার।'

'বেআদপ? আমার জননী, রক্ষিতা নয় যে যে-কেউ এসে দখল নেবে। কী নাম তোর?'

'লক্ষ্মীনারায়ণ। আমিই এখন এই কিল্লার মালিক। এই, তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন। এগিয়ে যা। দখল নে।'

'খবরদার, লক্ষ্মীনারায়ণ।'

বকশীর লোকেরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখি দুই পক্ষ।

আকাশে সূর্য জ্বলছে উলংগ খাঁড়ার মতো।

'বাবু গৌরহরি কোথায়?' বকশী জিগ্যেস করলেন।

'এই তো ছিলেন?'

'শোনো লক্ষ্মীনারায়ণ এই জমি আমার। বাবু গৌরহরি সব জানেন।'

'বাবু গৌরহরি আমার জমি দখলের ব্যাপার নিয়ে এসেছেন। আমার লোকজন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের হাতে সময়ও বেশি নেই। আপনি আমাদের বাধা দেবেন না।'

'তা হয় না। এ জমি আমার। আমি বেঁচে থাকতে—'

মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ড ঘটে গেল।

লক্ষ্মীনারায়ণের লোকগুলো জমিতে নেমে পড়েছে। আর বকশীর লোকেরাও বাধা দিতে আরম্ভ করল। চিৎকার, আর্তনাদ। প্রচণ্ড আকারের দাঙ্গা বেধে গেল। লাঠি বল্লম তীর।

কী হচ্ছে বকশী বুঝতে পারছেন না। কারা হারছে, কারা জিতছে কিছুই ধরতে পারছেন না। বকশী শুধু বুঝলেন তাঁর লোকজন ওদের বাধা দিচ্ছে। চিৎকার, আর্তনাদ, রক্ত। আহত

হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। চোখের সামনে খেতভরা ফসলে যেন বর্গী দস্যুর হামলা শুরু হয়ে গেল। বকশী দেখলেন ক্ষত-বিক্ষত জমি, ফসল!

কতক্ষণ দাঙ্গা চলল কে জানে।

লোকজন ছুটে পালাল। আহত, ক্ষতবিক্ষত।

কারা চিৎকার করছে জয়ের। জমি ক্রমশ ফাঁকা হয়ে গেল। কোলাহল নীরব।

বকশী দেখলেন তাঁর লোকেরা জয়লাভে: তুমুল চিৎকার করছে। লক্ষ্মীনারায়ণের লোকজন পালিয়েছে।

কয়েকজন পাহারা বসিয়ে বকশী ঘর্মাক্ত শরীরে ফিরে এলেন।

কিন্তু খটকা কিছুতেই যায় না। ব্যাপারটা আসলে কী? ওরা কিসের জোরে তার জমি দখল করতে এসেছে। বাবু গৌরহরি কী এই রহস্যের কিছু জানে। সে তো তাঁকে এতদিন কিছুই বলে নি। রাহাংকিল্লা বিক্রি হয়েছে তিনি জানতেন। রাহাং-এর পাশেই তাঁর রোড়াং কিল্লা। ওরা কি রাহাং আর রোড়াং ভুল করেছে।

দুর্বল শরীরে অবসাদ লাগে। তন্দ্রাতুর আচ্ছন্নতা। আজকের এই দাঙ্গার ব্যাপারটা ভুলতে পারছেন না তিনি। আর ওই লক্ষ্মীনারায়ণ! বিষয়টা অনেকদূর গড়াবে। সরকারের দৃষ্টিতে পড়বে। তার মানে আর-একটা আবর্ত, জটিলতা। কালেক্টার ওয়েবসাহেব তো জানেন, তাঁরই আমলে দ্বিতীয়বার চুক্তি হয়েছে বকশীর সঙ্গে। ত্রিবার্ষিক চুক্তি। তিনি নিয়মিত খাজনাপত্র দিয়ে আসছেন। বাবু গৌরহরি তার সাক্ষী। তবে ওই লক্ষ্মীনারায়ণ কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল! লোকটাকে দেখে তো ধনী বলে মনে হল না, সে এত টাকা পাবে কী করে। তবে কী কেউ পৃষ্ঠপোষকতা করছে ওর!

বকশী বাবু গৌরহরির গৃহের সুমুখে দাঁড়ালেন।

'বাবু গৌরহরি আছেন নাকি?'

গৃহ নিঃশব্দ।

বকশী আবার ডাকলেন।

কোনো সাড়া নেই।

বকশী চিন্তিত মুখে ফিরলেন।

বাড়িতে ফিরে শয্যায় দেহভার এলিয়ে দিলেন। আর দিতেই মনে হল তিনি আবার বন্দী হয়ে পড়েছেন। বিশ্ব সংসারের বাইরে এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে পড়েছেন। রক্তের মধ্যে উদ্বিগ্ন অস্থিরতা। আবার লক্ষ্মীনারায়ণের বেআদপ মুখ কুৎসিৎ ভঙ্গিতে নৃত্য করে উঠল। নিরেট পাথরের মতন অন্ধকার, পাথরটা তাঁর বুকে চেপে বসছে। তাকে উপড়ে ফেলতে হবে। যতক্ষণ না বিষয়টাকে মীমাংসার সূত্রে টেনে আনতে পারছেন, মনকে সুস্থির করতে পারছেন, ততক্ষণ শান্তি নেই। মীমাংসা! বকশী ভাবলেন ঃ একমাত্র বাবু গৌরহরি করতে পারেন! অন্য সময় হলে তিনি অপেক্ষা করতে পারতেন। এখন চারদিকের এই অবস্থায় অপেক্ষাগুলি কাঁটা হয়ে বেঁধে। এখন সব কিছুতেই অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে নামছে।

বকশী এবার উঠে বসলেন। না ঃ বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারছেন না তিনি। বকশী পালকি তৈরি করতে বললেন। পালকি এলে চেপে বসলেন।

'বাবু গৌরহরি চলো—'

'কে?' বাবু গৌরহরির কণ্ঠস্বর অন্ধকারে সাপের ফণার মতন দুলছে, চকচক করছে চোখ, বসন আলুথালু, গৌরাঙ্গ অবস্থা।

'কে বাবা এই অসময়ে?' গৌরহরির গলা নেশায় কাঁপছে।

'আমি বকশী জগবন্ধু—'

'আরে, কী আশ্চর্য! আসুন আসুন বকশী মহারাজ—' গৌর-

হরি অভ্যর্থনা করতে গিয়ে টলে পড়ে। 'বসুন বসুন। কী সৌভাগ্য। কে আছিস? বকশীজীকে একপাত্র দে।'

ঘরে পিদিম জ্বলছে। হাওয়ায় আলো কাঁপছে।

বকশী ছায়া-ছায়া আলোয় ঘরের অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন। শুধু গৌরহরি নয়, ঘরের অন্ধকার কোণে আর-একটি প্রাণীর উপস্থিতি কল্পনা করা যাচ্ছে। একটি নারীমূর্তি পরিপূর্ণ নগ্ন, পুঞ্জীভূত অন্ধকার জড়ো করে উচ্ছ্রিত পড়ে আছে। ।নিশ্বাস আছে কী নেই, মৃত! নাঃ বিড়বিড় করে কী বকছে।

বকশী নিশ্বাস রোধ করে জিজ্ঞেস করলেন: 'ও কী?'

গৌরহরি কৃতিত্বের হাসি হাসল। 'মেয়েমানুষ। খাঁটি চিজ্। দেখবেন জিনিসটাকে? দু'বোতল গিলেই শয়তানের বাচ্চার মতো দামড়াচ্ছে।'

বকশী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ওকে যেতে বলো। এ কদর্য দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারছিনে।'

গৌরহরি হাতে তালি বাজালো: 'এই, যা—ভাগ—'

মেয়েটির নড়বার ক্ষমতা নেই।

গৌরহরি কাছে গিয়ে ওকে টেনে তুলল। এলোকেশী রক্তপায়ী শ্বাপদের মতন দেখাচ্ছে ওকে। বিরাট শ্রোণীদেশ, কঠিন স্তনযুগ। ওকে দরজার বাইরে ছুঁড়ে মারল গৌরহরি।

'বলুন বকশীজী, আমি কী করতে পারি—'গৌরহরি বোতল থেকে ঢকঢক করে খানিক উগ্র তরল পানীয় গিলে ফেলে হেঁচ্‌কি তুলতে লাগল।

বকশী বললেন, 'সংক্ষেপে সেরে নিই। আপনি আজকের দাঙ্গার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানেন। কে এক লক্ষীনারায়ণ আমার কিল্লা রোড়াং দখল করতে এসেছিল—'

গৌরহরি জড়ানো গলায় বললে, 'ল—ক্ষ্মী—না—রা—য়—ণ। নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।'

বকশী বললেন, 'সে নাকি আমার কিল্লা খরিদ করেছে। কী বে-আদপ বলুন তো, আপনি তো জানেন ও জমি আমার। নিয়মিত আপনার কাছে খাজনা জমা দিচ্ছি।'

'ও হো মনে পড়েছে। যথার্থই ও জমি কিনেছে। 'রাহাং ওঘাইরা' নতুন নাম হয়েছে কিনা গবরমেণ্টের নথিপত্রে।'

'রাহাং ও কিনতে পারে, রোড়াং তো আমার।'

'রোড়াং!' গৌরহরি যেন মুখস্থ করছে নামটা: 'রো—ড়া—ং। কই, এ নাম তো আমার নথিপত্রে নেই। রাহাং ওঘাইরা।'

'আপনি কী পাগল হলেন বাবু গৌরহরি! আপনি অপ্রকৃতিস্থ তাই প্রলাপ বকছেন।'

'প্রলাপ! নাকি বিলাপ! প্রলাপের ভাই!' ফ্যা ফ্যা করে হাসল আর নাক ঝাড়ল গৌরহরি।

'বাবু গৌরহরি, এটা রসিকতার সময় নয়!'

'তাই বুঝি?' গৌরহরি চোখ কুতকুত করল।

'আমি বুঝতে চাই ব্যাপারটা? বলুন আপনি কী জানেন?'

'বললাম তো লক্ষ্মীনারায়ণ রাহাং ওঘাইরার দখল পেয়েছে। কাগজপত্র আমার কাছে এসেছে।'

'কিন্তু রোড়াং তো আর রাহাং ওঘাইরার ভেতরে নেই?'

'কী মুশকিল, রোড়াং-এর কোনো নামই আমার খাতায় নেই। নতুন নাম হয়েছে ওই রাহাং ওঘাইরা।'

'আমি কিছুই বুঝতে কারছিনে। আমি এতদিন আপনাকে নিয়মিত খাজনা দিয়েছি—'

'দেননি বলেছি কী?'

'তবে?'

'তবে কী?' গৌরহরি আবার একপাত্র ঢালল।

'আপনি তো রোড়াং-এর নামেই জমা করেছেন।'

'দেখুন বকশী, আমি সরকারী তহশিলদার, সরকারী স্বার্থ দেখাই

আমার কর্তব্য। কাজেই, খাজনা কেউ জমা দিতে চাইলে সেটা নেয়াই আমার কাজ।'

'কিন্তু কার জন্যে খাজনা নিলেন সেটা দেখা কী আপনার কাজ নয়?'

'আমি আদার ব্যাপারী। সে সব দেখবেন কালেক্টার বাহাদুর, কমিশনার। আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, সেখানে যান।'

'বাবু গৌরহরি কী আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'না। ভয় দেখাব কেন? আমি কেবল বলতে চাইছি, আপনার জমির ব্যাপারে কোনো গোলমাল দেখা দিলে উপরওলাদের সঙ্গে দরবার করাই ভালো। আমি তো কাজ করার যন্ত্র ছাড়া কিছু নই, বকশী। যেমন হুকুম হবে'

বকশীর কী মাথা ঘুরছে! নাকি দুর্বলতার জন্যে এমন মনে হচ্ছে। চোখের সামনে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। যেন প্রকাণ্ড এক ধাঁধার মতন বোধ হয়। বাবু গৌরহরির কথাগুলো আরও জটিল করে দিচ্ছে। গৌরহরি মাতাল হয়ে যায়নি তো, প্রলাপ বকছে না তো! তাঁর কিল্লা রোড়াং-এর কোনো নাম নেই তার নথিতে! অথচ, নির্বিবাদে সে এতদিন খাজনা জমা করেছে। রাহাং ওঘাইরা এই নামের তলায় কী তার রোড়াং তলিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে? কিন্তু এ কী করে সম্ভব। সরকারের সঙ্গে তাঁর চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা আছে! কালেক্টার ওয়েব সাহেবের তো না-জানার কথা নয়।

বকশী আর দাঁড়ালেন না, অন্ধকারে শিবিকায় গিয়ে উঠলেন।

অন্ধকার রাত্রি, দুর্ভেদ্য, কঠিন!

বকশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। যেন এই সংসারের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাঁচতে হলে বিশ্বাস দরকার। সহসা বিদ্যুতের মতো মনে ঝলসে উঠল: বাবু গৌরহরি এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই তো! তা'রি গোচরে এ সমস্ত বিষয় ঘটেনি কি! তবে কী সে

জেনে-শুনেই তাঁকে এই ষড়যন্ত্রের অধীন করেছে? এমনকি ইচ্ছে করেই তাঁর খাজনা রোড়াং-এর খাতে দেখায় নি? কী সর্বনাশ! বকশীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এরা কি তাঁর কিল্লা থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করতে চায়? তার অর্থ ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য, জীবনধারণের শেষ অবলম্বনটুকু থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা!

বকশীর ক্রোধে গর্জন করা উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য! তিনি প্রচণ্ড রকমের নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। এবং দুঃখ, বিষাদ। ন্যায়নীতি জাতীয় সাধু প্রশ্নগুলি তাঁর মনে জাগছে। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়! কিন্তু জোর পাচ্ছেন না। গভীর চিন্তার দহে তাঁর কার্য-কুশলতা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। তিনি এত চিন্তা করছেন, বকশী স্বগত উচ্চারণ করেন: চিন্তা তো সমাধান নয়। চিন্তা কোনো কাজ নয়! তবে কী তিনি কর্মদক্ষতা হারিয়ে ফেলছেন? আর, অদৃষ্ট নামক অন্ধ গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছেন! লক্ষ্মীনারায়ণের নোংরা মুখের আকৃতি আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। লোকটা কে, কোথা থেকে এল, জমিদারী খরিদ করবার মতো অর্থ তার এল কী করে! লোকটাকে অপ্রত্যাশিত অসম্ভব পদার্থের মতন মনে হয়। বিপদ যখন আসে এমনি করেই আসে, খবর না দিয়ে। বাবু গৌরহরি কী লোকটার পরিচয় জানে! বাবু গৌরহরি—এই মুহূর্তে মদ্যপ, অসংযমী ভণ্ড লোকটাকে তাঁর ঘৃণা করতে ইচ্ছা করল। বাবু কৃষ্ণ-চন্দ্রের সহোদর! বাবু কৃষ্ণচন্দ্র! ‘বাঙালী বুদ্ধিমান জাতি।’ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র কী জানেন এ সমস্ত ঘটনা! যেন তাঁর খুরদা আসার সঙ্গেই এই দুর্বিপাক ঘটে গেল। নাঃ আর ভাবতে পারেন না বকশী। ভাবনা কোনো কাজ নয়, আবার বললেন তিনি।

বকশী শেষ পর্যন্ত যেন কূল খুঁজে পেলেন।

এই সমস্ত বিষয় জানিয়ে তিনি কমিশনার মিস্টার বুলার-এর কাছে আর্জি পাঠালেন। ন্যায়নীতির দিক থেকে কমিশনার নিশ্চয়ই তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করবেন।

বকশী পরদিনই পত্রসহ কমিশনারের দরবারে দূত পাঠিয়ে দিলেন। লোক ফিরে এল। জানালেন, ও পক্ষ থেকেও দরখাস্ত গেছে।

তারপর অনেকদিন আর কোনো সংবাদ নেই।

বকশী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

বারো

বকশী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু দুর্ভাবনা গেল না। চার দিকের ঘটনাপুঞ্জ জটিল হয়ে আসছে চোখের সামনে। বকশী উঠতে বসতে কেবল সংকটের ত্রাস দেখেন। হৃতসন্তান ফিরে পাওয়া গেলে যেমন পিতার অতিরিক্ত মনোযোগ তার ওপর এসে পড়ে, তেমনি বকশী সব সময় পড়ে রয়েছেন তাঁর কিল্লায়। একটু অমনোযোগী হলেই যেন হাতছাড়া হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত তদারকি ছাড়াও তাঁর লোকজনদের পাহারায় বসিয়েছেন।

সেদিনের ঘটনার পর আর বাবু গৌরহরির সঙ্গে দেখা হয় নি। গৌরহরি তাঁকে এড়িয়ে চলতে চায়। তার অর্থ, সেও এই ষড়যন্ত্রে আছে। হয়তো অনেক কিছুই জানে। সবচেয়ে বেদনা পেয়েছেন তিনি—যখন শুনলেন তাঁর দেয়া খাজনা গৌরহরি মৌজা অনুযায়ী জমা করেনি। আশ্চর্য! তার নথিপত্রে নাকি কিল্লা রোড়াং-এর নামই নেই।

অথচ ওয়েবসাহেবের সঙ্গে তার তিনশালা বন্দোবস্ত পাকা। এখনো তার মেয়াদ ফুরোয় নি। ন্যায়নীতির ধ্বজাধারী গোরারাজত্বে এই সব সম্ভব হচ্ছে! না কি ন্যায়নীতি কাঞ্চন মূল্যে কেনা যায়।

এতদিনে অনেক রহস্য জানতে পেরেছেন বকশী। লক্ষ্মীনারায়ণের পেছনে কার কালো হাত—কিসের খুঁটির জোরে ভেড়া লাফাচ্ছে।

দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র! বাঙালী বুদ্ধিমান জাতি। বুদ্ধির অর্থ কৌশল। বিপুল বৈভবে কৃষ্ণচন্দ্র সর্বত্র তাঁর লোভের হাত বাড়াতে চান। এই মানুষটি সম্পর্কে বকশীর একধরনের শ্রদ্ধা ছিল। তার সঙ্গে এই অমানুষিক চাতুরির ফলে বকশী এখন বুঝতে পারছেন, বস্তুত দেওয়ানজী তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন না। হয়তো করুণা করতেন।

ক্রমশ এদেশে ধনী বাঙালীসমাজ গড়ে উঠছে! দপ্তরে, আদালতে গোরা সরকারের তারা দক্ষিণহস্ত। এই ধনিকগোষ্ঠী এ দেশের মানুষকে—কী ছোট কী বড়—কারুকে শ্রদ্ধা করে না। লোভ ও ঈর্ষায় তারা জর্জরিত। নিজের বাসভূমেই যেন এদেশের লোকেরা পরবাসী হয়ে যাচ্ছে।

বকশীকে ভয়ানক চিন্তিত দেখায়। ১৮১৩। ইংরেজ রাজত্বের দ্বাদশ বছর। এই দীর্ঘ বারো বছরেই দেশটা রূপে-চরিত্রে পাল্‌টে যাচ্ছে। নিয়তির মতন নিষ্ঠুর না-জানা ভবিষ্যতের ঘূর্ণিতে ছুটে চলেছে। কোন্‌দিকে তাকাবেন বকশী? অতীত রিক্ত, বর্তমান শূন্য, এবং ভবিষ্যৎ—

এই অগণন জনতার স্রোতকে নিরীক্ষণ করেন বকশী। কী বিপুলায়তন, কী প্রচণ্ড শক্তিধর! অথচ মূষিক-চক্ষু। ওই খর্ব চোখ দিয়ে প্রচণ্ড শক্তির আয়তনকে ধরতে পারে না তারা। হস্তীর মতন অবস্থা।

আবার চোখের সামনে দীর্ঘ পুরু অন্ধকার নেমে আসে। অন্ধকারটা বন্য-বরাহের আকার নেয়। ভীম-ভয়ংকর।

বকশী বিরাট জনতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন, একক বোধ করেন। নিজের আত্মচিন্তার দুর্গে তিনি বন্দী। দেশ নয়, দেশের মানুষ নয়, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীতে বাঁধা। কিল্লা রোড়াং। রোড়াং কী দেশ নয়। বৃহত্তর দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। পারেন কী

রোড়াং-কে তুলে নিয়ে বুকের নিভৃতে লুকিয়ে রাখতে। বকশী নিজের ভেতরে যুগল মানুষের অস্তিত্ব বোধ করেন। দুটো অস্তিত্বের টানা পোড়েনে ক্লান্ত, অবসিত বকশী। তার মনের জগৎটা কী জটিল হয়ে পড়ছে না? অথবা জনতা থেকে নির্বাসিত হয়েই এই অবস্থা?

ধর্ষিতা নুরান। তাঁর দেশ, তাঁর মানুষ—। মহান্ যৌবন যন্ত্রণায় মাথা কুটে মরছে। এলোকেশী, নগ্নিকা, রক্তখিন্ন। তার চিৎকারের শিস্-ধ্বনিতে বায়ুস্তর ছিন্নভিন্ন, কম্পিত ধোঁয়ার শরীরের মতন সে এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে।

গোরা রাজত্বের দীর্ঘ বারো বছর। বকশী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এক অপরাহ্নে বকশীর লোক ফিরে এল কালেক্ট্রি থেকে।

তাকে দেখে চমকালেন বকশী।

'কী খবর? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'দেবতা, দুঃসংবাদ আছে।' মাথা নীচু করে লোকটা বললে।

বকশী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

'কৃষ্ণচন্দ্রের লোক আবার জমির দখল নেবার জন্যে আবেদন করেছে সেরেস্তায়।'

বকশী রুদ্ধনিশ্বাসে বললেন, 'তারপর?'

'ওরা এবার উঠে পড়ে লেগেছে। জানেন তো দপ্তরে দেওয়ানজীর কী প্রতাপ! কালেক্টার তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। সরেজমিনে তদন্ত হবে।'

বকশী পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন। অচল অনড়। তাঁর মনে হল তিনি পাথর হয়ে যাচ্ছেন অনেকদিন থেকে। পাথরের মতন বিকারহীন, জড়, নিস্পন্দ।

'অবশ্য আমাদের সুবিধাই হল।' লোকটা বললে। 'তদন্তে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে। ওরা রোড়াংকে রাহাং-এর সঙ্গে জড়িয়েই

তো ব্যাপারটা জট পাকাচ্ছে। ওদের এই শয়তানি এবার বন্ধ হবে।'

বকশী কঠিন স্তূপের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি যেন জমে পাথর হয়ে গেছেন। একটা প্রাচীন শিলা।

অদূরে গাছগাছালির আড়ালে সূর্যাস্ত রঙিন হয়ে উঠেছে। বিষণ্ণ সুরে উড়ন্ত পাখির পক্ষ-বিধুনন। জবাকুসুম সঙ্কাশং—।

লোকটা বিদায় নেবার পরও দিগন্তের দিকে চেয়ে, মূক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বকশী। একটা নির্জন উলংগ বেদনানুভূতি তাঁকে বিধুর করে রেখেছে। বকশীর চোখের সামনে সমগ্র দিগন্তে তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটা যেন তারের মতন নেচে ওঠে। জীবন মানে জীবন-ধারণ। প্রৌঢ়ত্বের সীমানা থেকে জীবনটা আশ্চর্য ঠেকে। তিনি এতদিন বেঁচে ছিলেন, আছেন। কেন? জীবন কী? অভিজ্ঞতা। বেঁচে-থাকার অর্থ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এই জীবনটা, এই কংকালটা একদিন ছেড়ে যেতে হবে। বাসাংসি জীর্ণানি। হায় জীবন! এই জীবন কে দিল তাঁকে? যেন অন্যের জীবনটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ক্লান্ত পথিকের মতন। আর পারছেন না একে বহন করতে।

বকশী অবাক হয়ে যান: তিনি আর ক্রোধে উদ্দীপিত হতে পারেন না। তাঁর শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেছে। বাইরের কোনো আঘাতেই আর প্রতিক্রিয়া জাগে না।

সমস্ত কিছু ভেঙে যাচ্ছে। পুরনো প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। কে জানত মহারাজা মুকুন্দদেবের রাজত্ব অস্ত যাবে - গেলও। কেউ ঠেকাতে পারেনি। ইতিহাস-বিধাতা নিষ্ঠুর, নির্দয়। কালস্য কুটিলা গতি।

না। আর ভাবতে পারেন না বকশী। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন।

একেক দিন ঘুম ভেঙে ওঠেন আর ক্লান্ত, জীর্ণ আর হতাশ লাগে। সারা রাত্রি নিদ্রাহীন কাটে। মনে হয় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। ক্ষয়! গোধুলির হলদেটে সূর্যের মতন। অলিন্দে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ সূর্যোদয়-

সূর্যাস্ত দেখেন—দেখেন নতুন দিনের বৈজয়ন্তী উড়ছে। গোরা সাহেব, সিপাহী। তাদের গতিশীল জীবনযাত্রা, পরিবর্তনের উঁচু সুরে বাঁধা। আর, মানুষ কালো কালো উলংগ বীভৎস রকমের নিঃস্ব। কোনোদিন পথে বেরুলে মনে হয় পিছন থেকে নিঃশব্দ চক্ষু তাঁকে অনুসরণ করছে। তাঁর ওপর চোখ আছে। বকশীর নিজেকে কয়েদী মনে হয়। গোটা রাজ্যটাই কয়েদখানায় ছেয়ে গেছে। মানুষ কয়েদী, বকশীর মনে দার্শনিকতা উদয় হয়ঃ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। জন্ম বন্ধন, মৃত্যু বন্ধন। এই বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি নেই। মুক্তির কথাও ভাবেন তিনি। আশ্চর্য! বন্ধন আছে বলেই মুক্তির কথা ভাবতে পারেন। আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনে জড়ানো। সারা জীবনে কত সঞ্চয় করেছেন। এই সঞ্চয়গুলি বন্ধন, বিরাট পাহাড় হয়ে তাঁকে গ্রাস করেছে। কবে কখন এই সমূহ সঞ্চয়েরই তিনি অংশ হয়ে গেছেন।

তারপর একদিন চোখের সামনেই দেখলেন সরকারী পার্টির লোকজনকে। তিন দিন ধরে সরেজমিনে তদন্ত চলছে। সাক্ষীসাবুদ নিল। বকশীর নথিপত্র দেখল।

বকশী নির্বিকারে ওদের কাজকর্ম দেখলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না। যা হয় হোক—এমন একটা মনোভাব তাঁকে নিষ্ক্রিয় রাখল।

সরকারী পার্টি সদরে রিপোর্ট করতে বিদায় নিল।

দু'একদিনের ভেতরে খবর এল। সরকার সমস্ত ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্রটা পরিষ্কার আবিষ্কার করতে পেরেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দাবি ভুয়ো। কিল্লা রোড়াং আর রাহাং দুটো পৃথক মৌজা। অতঃপর নির্দেশ এল দুটো মৌজাই অবিলম্বে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

সুখবর পেয়ে বকশীর লোকজনেরা সেদিন আনন্দে উৎসবে মুখর হয়ে রইল।

অলিন্দ থেকে বকশী ওদের আনন্দের কোলাহল শুনলেন। কিন্তু তিনি কেন কিছুতেই তাজা হতে পারছেন না। মনের ওপর যে বিষাদ ছায়া ফেলে রয়েছে তাকে তিনি দূর করতে পারছেন না। ঘটনার আবর্ত তাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ঘটনাগুলি ধরতে পারছেন না, বুঝতে পারছেন না। কোনো ঘটনার ওপরই তিনি আস্থা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না। একেকটি দিন আর রাত অন্য রকম। সুখবরে আনন্দে নেচে ওঠা উচিত, কিন্তু কে বলতে পারে পরের দিন কী হতে পারে! ঘটনাগুলি তরঙ্গের মতন তাঁকে নাচাবে, আর তিনি নাচবেন। এবং তারপর—

সরকারী নির্দেশনামা তো এসেছে। হ্যাঁ, এসেছে। কিন্তু কে বলতে পারে এই নির্দেশনামারও বদল হবে না। তিনি কিসে বিশ্বাস করবেন, কাকে করবেন, কেন করবেন? এ যুগ অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা অসত্যের। নাঃ বার বার বিশ্বাস করে তিনি আর ঠকবেন না। আশা-বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আর কিছু করবেন না। ধীর শান্ত অবিচলিত চিত্তে যে কোনোরকম নিয়তির বিধানকে মেনে নেবেন। নিয়তি কেন বাধ্যতে। চোখের পরদায় অন্ধকার নেমে এসেছে, গাঢ় পিঙ্গল রুগ্‌ণ, সূর্যাস্তের বিবর্ণ হলদেটে আভা, ক্ষয়—।

'—অবিলম্বে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।' সরকারী 'অবিলম্বে' শব্দটার অর্থ বোধ করি আলাদা। দিনের পর দিন কাটে। কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় না। খারাপ চিন্তা করাটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে বকশীর কাছে।

ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে ১৮১৪—জুন মাস। সরকারী পুরু লেফাফায় নির্দেশ এল। 'আপাতত পৃথকীকরণের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়েছে। যেহেতু রোড়াং কিল্লার ওপর বকশী জগবন্ধুর মূল স্বত্বে আপত্তি উঠেছে। অতএব সরকার বাধ্য হয়ে দুঃখের সঙ্গে উক্ত মৌজার বন্দোবস্ত বকশীর সঙ্গে এক্ষুনি করতে পারছেন না। ইতিমধ্যে

বকশীকে জমির ওপর তাঁর দাবি বিধিসম্মত আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।'

মূল স্বত্ব—বিধিসম্মত আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত—

মূল স্বত্ব! দীর্ঘকাল ধরে এই জায়গীর স্বত্ব তিনি ভোগ করছেন। রাজকার্যের পুরস্কার! এই স্বত্ব মারাঠারা মেনে নিয়েছে; কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। এই সেদিন ইংরেজ-সরকারও তাঁর স্বত্ব স্বীকার করেছেন। স্বীকার না করলে তাঁর সঙ্গে এতদিন বন্দোবস্ত করলেন কী করে?

বকশী বহুদিন পর আহত শ্বাপদের মতো চিৎকার করে উঠলেন, গর্জন করে ইঠলেন। এ অবিচার, অন্যায়, জবরদস্তি। কোনো ন্যায়নীতি একে সমর্থন করে না।

বকশী তীব্র প্রতিবাদ পাঠালেন।

গোরা-সরকারের নির্দেশ নড়ে না। আইন! বকশীকে আইনের পথে এগোতে হবে। তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।, আইন আইন। কার কাছে তিনি যাবেন আইনের আশ্রয় নিতে? আইন কার জন্য, কাদের জন্য? শক্তিমানদের জন্যে, দুর্বলের কাছে আইন পাষণ্ড অত্যাচার।

হিতৈষীরা বললে, আদালতে মামলা রুজু করুন।

আদালত! মামলা! আদালতে কাদের কাছে তিনি ধরনা দেবেন! বড় বড় পদস্থ কর্মচারী বাঙালী। যার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াবেন সেও বাঙালী। প্রতিপত্তিশালী, সম্ভ্রান্ত, ধনী। আর আদালত মামলা মানেই টাকা। অজস্র টাকা।

হিতৈষীরা বললে, 'হাইকোর্টে যান।'

হাইকোর্ট! সে তো বাঙলাদেশে—কলকাতায়। এত দূর যেতে খরচ আছে। রাহা খরচ। মামলার খরচ। থাকার খরচ। কিল্লা থেকে যদি আয় না হয় তাহলে টাকা আসবে কোথা থেকে? সংসারের খাইখরচই কুলোবে না।

হিতৈষীরা বললে, 'আমরা জোগাব খরচ।'

তাতে সংসারের খরচ চলবে। স্ত্রী পরিবার দু'মুঠো খেতে পারবে। চলবে না কলকাতায় যাওয়া। চলবে না মামলার খরচ টানা।

বকশী চোখের সামনে দুর্দিনের প্রেতকে নৃত্য করতে দেখলেন। ক্ষুধা, অনশন, ভিক্ষাবৃত্তি।

হিতৈষীরা বললে, 'আপনার বর্তমান অবস্থা জানিয়ে সরকারের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন করুন।'

মহারাজা মুকুন্দদেবের মন্ত্রী—বকশী জগবন্ধু বিদ্যাধর মহাপাত্র ভবানীপুর রায় তাঁর দীন অবস্থা জানিয়ে আবেদন করবেন গোরা সরকারের কাছে! আত্মরক্ষার চেয়ে বড় আত্মসম্মান। তা তিনি কিছুতেই করতে পারবেন না।

বকশীর জীবনযাত্রা প্রচণ্ড ঝড়ে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারেন না। কিল্লা রোড়াং-এ ঘুরে বেড়ান। সঙ্গে তাঁর অনুগত পদাতিক বাহিনী। সুখ-দুঃখের সাথী। দুর্দিনে বকশীকে তারা ছাড়তে চায় না।

তিনি এতদিন কী করে ভুলে ছিলেন তাঁর অনুগত সাথীদের? ওরা তো তাঁকে একদিনও ভোলেনি। আজো তারা মহামান্য বকশী হিসেবেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। অথচ - তিনিই ওদের ভুলে ছিলেন, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন। ব্যক্তিগত হিসেব-নিকেশের দিকে চেয়ে দিন কাটাতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তি! বকশী আপনমনে হাসলেন; না, ব্যঙ্গ করলেন নিজেকেঃ তাঁর এই ব্যক্তি-পুরুষটি দাঁড়িয়ে আছে এদের স্বীকৃতিতে। ব্যক্তি জগবন্ধু কে? কেউ নয় কিছু নয়। বকশী জগবন্ধুই তার একমাত্র পরিচয়। আজো এই মুকুটহীন অবস্থাতেও ওরা তাঁকে বকশী বলেই সম্মান করে। তিনি নিজেকে আলাদা করতে চেয়েছেন, বিচ্ছিন্ন করতে! কিন্তু তা করা যায় না। কারণ তাঁকে বকশী হয়েই মরতে হবে।

বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগ করতে চেয়েছিলেন, অথচ তা মিথ্যে। ওরা তাঁর দুঃখকে আপন করে নিয়েছে, শরিক হয়েছে।

অধিকারচ্যুত কিল্লার সীমানায় দাঁড়িয়ে গোটা রাজ্যের জন্যই পুনর্বার অপরিসীম বেদনা বোধ করলেন বকশী। উলঙ্গ এলোকেশী রক্তাক্ত-শরীর তাঁর দেশ, যন্ত্রণায় পাথরে মাথা কুটে মরছে। হিহি করতে করতে সে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তার বুকের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে। মা, মাগো, তোমার বড় কষ্ট।

অকস্মাৎ একদিন বকশী নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

দীর্ঘ দুটি বর্ষ।

তেরো

আঠারো শ' সতেরো। মার্চ মাস।

দীর্ঘ দু বছরের গুমটের পর এবারের গ্রীষ্মে অগ্নিকোণের তল্লাটে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল। প্রত্যুষেই যেন ভয়াবহ মসীমাখা সন্ধ্যা নেমে এল। মেঘটা অলক্ষ্যে বৃহৎ আকাশের নীলকে গ্রাস করে ফেলল। বাতাসে কেমন বারুদের গন্ধ, দিগন্তে লাল ধুলো উড়ছে। মেদিনী কাঁপছে, পাতালের গভীর থেকে দ্রিমিকি দ্রিমিকি শব্দ। প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতে জ্বলন্ত গলিত লাভা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসতে লাগল।

শয়ে শয়ে জনতা উন্মত্ত রণসাজে সজ্জিত হয়ে নেমে এল গুমসুর থেকে খুরদা রাজ্যে। চারশো খণ্ড জাতি, কোমরে তলোয়ার, দীর্ঘ দিনের রণপিপাসায় তারা তৃষ্ণার্ত।

পাইকরা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি, পরে বুঝল। দেখল তাদের নেতাদের। একদা এদেরই নেতৃত্বে তারা যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাপুড়ের হাতে ডমরুর আওয়াজে সাপের মতো তারাও গর্ত থেকে ফণা তুলে বেরুল। সাজ সাজ রব। ললাটে দীর্ঘ লাল সিঁদুরের ফোঁটা, সমস্ত মুখ রঞ্জিত, হাতে তরোয়াল, ওরাও শামিল হয়ে গেল। ওদের দেখে মনে হচ্ছে রক্তপায়ী হিংস্র শ্বাপদ।

চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পড়ল। অশ্বক্ষুরে ধুলো উড়ছে, ধুলোর মেঘ। এবং বাতাসে বারুদের গন্ধ।

'চলো বানপুর চলো—'

জনতা ছুটে চলল। বানপুর—বানপুর। যেন তাদের সামনে একটি লক্ষ্য বানপুর। ভোঁতা মরচে-ধরা অস্ত্রগুলোকে তারা

বুকের আগুনে বিশুদ্ধ করে নিয়েছে, তীব্র তীক্ষ্ণ আবেগে ধারালো করেছে। নিয়তির মতো তারা ছুটে চলেছে। কালো পাথরের মতো শরীর বেয়ে স্বেদ ঝরছে, ধুলো-কাদায় পিছল ক্লেদাক্ত শরীর। রঞ্জিত মুখ গলে গলে পড়ছে। উধর্বশ্বাস প্রতিযোগিতা। কে আগে ছোটে। কেউ পিছনে পড়ে থাকতে চায় না। বানপুর তাদের চোখের সামনে নৃত্য করছে, অন্ধকার লাল হয়ে দুলছে চোখের সামনে। চলায় এমন গতি আছে, তারা অনেকদিন ভুলে গিয়েছিল। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেশী দুলছে, হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। আর বর্শার আগায় যেন তারা ঝুলিয়ে নিয়েছে তাদের যত ভয় যত কাপুরুষতা, দীনতা। ওরা নিজেরাই বলাবলি করল : আমরা এতদিন থেমে ছিলাম, তাই এতদিন ভয় কাপুরুষতা আমাদের জড়িয়ে ধরেছিল। আমরা নিজেরাই নিজেদের জালে আটকা পড়েছিলাম। চলো বানপুর চলো। রক্তে বাজছে একটি মন্ত্র : বানপুর—বানপুর।

ওই দেখা যায় বানপুর। থানা সরকারি ভবন।

নিশ্চিত মৃত্যুর মতো একযোগে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল থানার ওপর। কোনো রকম প্রতিরোধের আগেই শেষ করতে হবে। চিৎকার, আর্তনাদ, রক্ত, মৃত্যু। সব ছাপিয়ে পাইকদের উন্মত্ত উল্লাস। হত্যা, নির্মম, নিষ্ঠুর। কত লোক সাবাড় হল ? শ'খানেক ? না, বেশি। হোক।

একদল ছুটে গেল সরকারি ভবনের দিকে। মৃত্যু। মৃত্যুর মতো নিঃশব্দ হয়ে এল বানপুর। হাতে পনেরো হাজার সরকারি মুদ্রা।

বিজয়ী জনতা এবার প্রত্যাবর্তন করল।

ফেরার পথে দেখা হল চিল্কার সশস্ত্র জনতার সঙ্গে।

'কী, সংবাদ শুভ তো ?'

'লবণের এজেন্ট বীচারসাহেব একটুর জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেল।'

'জানোয়ারটা ভাগল।'

'তবে ওর নৌকো আমরা আটকেছি, দখল করেছি। সমস্ত লুটপাট করে নিয়েছি।'

'ঠিক আছে।'

এবার ?

'চলো খুরদা—'

সশস্ত্র জনতা এগিয়ে চলেছে। পিলপিল করে লোক ঢুকছে। রক্ত-খাওয়া জোঁকের মতো ফেঁপে উঠছে জনতার সংখ্যা। বানপুর—বানপুর খতম। বানপুরের সাফল্য তাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গোরা সরকারকে শেষ ধাক্কা দিতে হবে। ইংরাজরাজ খতম।

'চলো চলো খুরদা চলো—'

খুরদা রাজ্যে পা দিয়ে ওরা অবাক। তাদের অভিযানের খবর পেয়েই সরকারি লোক উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছে। না গোরা সিপাহী, না দেশী সিপাহী। সরকারি বাড়িগুলি খাঁখাঁ করছে। এসো আমরা সৎকার করি, ওদের ভূতপর্ব আত্মার সদ্‌গতির জন্যে। নে ভাই, আগুন জ্বালা। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। নরকের লেলিহান শিখা। চিৎকারে আকাশ বধির হয়ে উঠছে। নাঃ টাঁকশাল থেকে টাকা নিয়ে ভাগতে পারে নি। নাও, লুট করো। মুহূর্তের মধ্যে টাঁকশালের সরকারি বাড়িগুলো ভস্মসাৎ হয়ে গেল।

'জয় মহারাজা মুকুন্দদেবের জয় !'

'জয় বকশী জগবন্ধুর জয় !'

বকশী গোপন স্থান থেকে এবার আত্মপ্রকাশ করলেন। এই দীর্ঘ দুবছরে তিনি শীর্ণ হয়েছেন। চোখ দুটো কেবল সন্ন্যাসীর মতো জ্বলে। এই দীর্ঘ আত্মগোপনের সময়গুলো তিনি উল্কার মতো ছুটে গেছেন এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চল। কোথাও কোনো নিয়মিত বাসস্থান থাকেনি। এক রাজ্য থেকে এক রাজ্যে

ছুটে গেছেন। তাঁর মর্মান্তিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। এই অন্যায় এই অপমান তিল তিল করে বাড়বে। কেউ এই অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। বাঁচতে হবে মানুষের মতো, নিজের অধিকারে মর্যাদায় স্বপ্রতিষ্ঠ। দেখো মহারাজা মুকুন্দদেবের অবস্থা, তিনি পুরীতে একরকম অন্তরীণ হয়ে রয়েছেন। এবং নিজে বকশী জগবন্ধু আজ পথের ভিক্ষুক। দিনের পর দিন কত বিনিদ্র রাত ছুটে চলেছেন বকশী। তাঁর সঙ্গে চলেছে অনুগত কিছু পাইক। বকশী কখন একদা জনতার সঙ্গে মিশে জনতা হয়ে গেছেন। ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর তাঁর মনে থাকেনি। তিনি বুঝেছেন এতদিনের বিচ্ছিন্নতা-ই দুঃখ এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি দেশকে জাগাতে পারবেন না। নিজের বাড়ি, স্ত্রী-সন্তানের কথাও মনে থাকেনি। এখন ওরাও তাঁর জনতার সংজ্ঞায় মিশে গেছে। এখন, খুরদায় পা দিয়ে তাঁর বাড়ির কথা মনে পড়ছে বই কি! আজকের রাত্রি তিনি ওদের সঙ্গে কাটাতে পারেন। কিন্তু, ভোর হতেই চলে যেতে হবে। অনেক কাজ বাকি।

'কে?'

'আমি কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধর—'

'সিরদার—'

'প্রভু—'

'সরকারী লোকজন পালিয়ে যাবে খুরদা থেকে ভাবতে পারিনি—'

'ওরা ভয় পেয়েছে প্রভু।'

'ওরা নিশ্চয় কটকে পালিয়েছে—' চিন্তিত গলায় বললেন বকশী।

'তাই সম্ভব প্রভু। কিন্তু ওরা খবর পেল কি করে?'

বকশী বললেন, 'গোলামরাই খবর দিয়েছে। তোমার মনে

আছে চরণ পটনায়কের কথা? সরকার ওকে আমার পেছনে লাগিয়েছিল। নরকের কীটকে মারব না বলে সেবার ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

কৃষ্ণচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, 'তবে কী চরণ…'

বকশীর চোখ জ্বলে উঠল। 'হাঁ। ও শেয়ালটা এখনো পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে রয়েছে।'

'আপনি এতদিন বলেননি কেন প্রভু?'

'চরণ গোপনে গোপনে খবর পাঠাচ্ছে: আমি মানুষকে খেপাচ্ছি। তুমি আজ রাত্রেই লোক পাঠাও। ও পরগনা লিম্বাই-এ লুকিয়ে আছে। ওকে একেবারে খতম করতে হবে।'

'যে আজ্ঞা প্রভু।'

'আজকের মতো ওদের বিশ্রাম করতে বলো। কালকে আমরা আন্দোলনের পরবর্তী ধাপগুলি ভাবব।'

কৃষ্ণচন্দ্র বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর বকশী বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

বাড়ির সিংদরোজার সামনে হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন বকশী। বাড়িটা সন্ধ্যার অন্ধকারে কালিধোয়া ছবির মতো দাঁড়িয়ে। কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। বহুদিন পর বাড়িটাকে অপরিচিত অচেনা লাগল বকশীর। বুকে একটা ব্যথা অনুভব করলেন। তিনি এতদিন এদের কোনো খোঁজ নিতে পারেননি, অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেছেন এদের। সে-ভাগ্য ওরা নিজেরা গড়েছে, ওদেরই নিজস্ব, সেখানে বকশীও নতুন, বিদেশী। ওরা কেমন করে বেঁচে আছে এতদিন। বকশী ঈষৎ কাঁপুনি অনুভব করলেন। এখন, এই মুহূর্তে মনে হল তিনি পালিয়ে যান। ওরা এতদিন তাঁকে ছেড়ে যদি চালাতে পেরে থাকে, তার অর্থ বকশীর এখানে কোনো প্রয়োজন নেই।

অন্ধকার ভেদ করে এক টুকরো মৌন মৃদু আলোকে এগিয়ে আসতে দেখলেন বকশী।

'এসো।'

'সত্যভামা।'

বকশী ঘোড়া থেকে নামলেন। আলো অনুসরণ করে নিঃশব্দে এগোলেন।

'কেমন আছ তোমরা?'

'ভালো।'

'পার্বতী?'

'আছে।'

খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে ও কে পার্বতী। পার্বতী অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? কেন তাঁর কাছে ছুটে আসছে না। বকশীর বুক বেদনায় মুচড়ে ওঠে: মূক ছবির মতো দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী, সন্তান। কিন্তু মাঝখানে যোজন ব্যবধান। ওরা কেউই এগোতে পারবে না, পারছে না। তবে কী বকশী বদলে গেছেন। ওরা তাকে সন্দেহ করছে অবিশ্বাস করছে।

কর্তব্য। বকশী কী কর্তব্য করেছেন ওদের সম্পর্কে। আবার ব্যক্তিগত জীবনটা তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, দুর্বল করে দিচ্ছে। বকশী নিজেকে অসহায় বোধ করলেন।

কিন্তু এছাড়া অন্য কী পথ ছিল, বকশী আবার ভাবলেন: সকলের নিরুদ্‌বিগ্ন ভবিষ্যতের জন্যে তাঁকে বৃহত্তর পথে নেমে পড়তে হয়েছে। তাঁর স্ত্রী-সন্তান, রোড়াং, সকলেরই ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। তবে কি ওদের অভিমান, পত্নীত্বের, বাৎসল্যের। কিন্তু তিনি তো শুধু পতি নন, পিতা নন, তিনি বকশী জগবন্ধু। এখনো কানে বাজছে 'বকশী জগবন্ধুর জয়।' বানপুর, খুরদা, লিম্বাই। এতক্ষণে ওরা চরণ পটনায়ককে সাবাড় করে দিয়েছে। বকশীর চোয়াল কড়মড় করে উঠল।

'আমাকে শেষরাত্রেই বিদায় নিতে হবে—' বকশী বললেন।

'জানি।' সত্যভামা মাথা নাড়লেন।

'ভয় কোরো না—'

'ভয়!' সত্যভামা শুকনো হাসলেন।

বকশী চুপ করে গেলেন। তিনি বুঝলেন ওদের কাছে এই আশ্বাস নিরর্থক। ওদের রাস্তাগুলি একান্ত ওদেরই নিজস্ব। ওদের ভয়-আশ্বাস ওদেরই, সেখানে বাইরে থেকে উপদেশ দেয়া অবান্তর।

'জানো তো আমাকে এখন আত্মগোপন করে থাকতে হবে—' বকশী বললেন: 'মাঝে মাঝে আমি লোক মারফত খোঁজ-খবর নেব।'

সত্যভামা বললেন, 'আচ্ছা।'

'এই টাকাগুলো তোমার কাছে রাখো।'

সত্যভামা বললেন. 'ওখানে রেখে দাও।'

বকশী একটা উদ্গত নিশ্বাস চেপে রাখলেন। তাঁর মনে হল সমস্ত কথা ফুরিয়েছে। কোনো পক্ষ থেকে আর-কিছু বলবার নেই।

রাত্রি দীর্ঘতর হল।

কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বকশী। বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভাঙল। মনে হল একটা বিরাট প্রস্তরখণ্ড বার বার তিনি পাহাড়ে তুলতে যাছেন আর সেটা গড়িয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড ঘামে শীত-শীত আর্তিতে যেন তিনি কাঁপছেন।

বকশী আর ঘুমোলেন না। অনেকক্ষণ পরে মনে হল এটা তাঁর গৃহ, বাসনার দুর্গ, আজন্ম বাসনা-সংস্কারের কারাগারে বন্দী। তাঁর স্ত্রী, সন্তান। বকশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই মুহূর্তে তাঁকে ভয়ানক নিঃসঙ্গ নির্বাসিত লাগছে। যেন বিচিত্র ঘটনাস্রোতে উপলখণ্ডের মতো তিনি গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছেন। ইচ্ছা করলেও তিনি এই যাত্রাকে নিরস্ত করতে পারেন না। এই ঘটনাগুলি

আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁকে বেঁধে ফেলেছে এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তা কখন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঘটনার প্রবাহে মিশে গেল। তিনি নিজেই কী ঘটনায় পরিণত হন নি! সাময়িক চাহিদাগুলো তাঁকে সৃষ্টি করেছে, তিনি উপলক্ষ মাত্র।

বকশী নিঃশব্দে বাড়ি থেকে নির্গত হলেন।

চোদ্দ

একটা প্রচণ্ড আঘাতের মতো দুঃসংবাদ গিয়ে পৌঁছল কটকে সরকারী মহলে। যখন ধীরে ধীরে গোটা রাজ্যে ইংরেজের সুষ্ঠু শাসন পরিচালনায় একটা স্থায়ী শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে সেই সময় একি অপ্রত্যাশিত উপদ্রব। মহারাজা মুকুন্দদেবের বিদ্রোহের পর দীর্ঘ তেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কোথাও কোনো বড়রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি।

এই খুরদা রাজ্য, একটা নিয়মমাফিক শিরঃপীড়া হয়ে উঠল।

ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ইম্পে কালহরণ করবার পাত্র নন। তখনি জরুরী সামরিক বৈঠক আহ্বান করলেন। উপদ্রবকে দ্রুত নিবারণ করতে হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। বানপুর, খুরদা, পরগনা লিম্বাই। কাজেই দ্বিমুখী অভিযান চালাতে হবে। একদল যাবে সোজা খুরদা, অন্যদল পিপলি অভিমুখে পরগনা লিম্বাই রক্ষার জন্যে।

'লেফটেনাণ্ট প্রিদো—'

'ইয়েস ইয়োর অনার—'

'আপনি সেনাবাহিনী-সহ সোজা খুরদা অভিমুখে অগ্রসর হোন।'

লেফটেনাণ্ট প্রিদো অভিবাদন করে প্রস্থান করলেন।

'লেফটেনাণ্ট ফ্যারিস—'

'ইয়েস ইয়োর হাইনেস—'

'আপনি সৈন্য নিয়ে পিপলির দিকে যাত্রা করুন। মনে রাখবেন পরগনা লিম্বাইকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।'

লেফটেনাণ্ট ফ্যারিস প্রস্থান করলেন।

মিস্টার ইম্পে ডাকলেন: 'লেফটেনাণ্ট ট্রাভিস—আমার মনে হয় এই সময়ে ঘটনাস্থলে আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতি ফলপ্রসূ হবে। আপনি ষাটজন সিপাহী মজুত রাখুন, আমরা পয়লা এপ্রিল রওনা হয়ে যাব। আমার উদ্দেশ্য খুরদায় লেফটেনাণ্ট প্রিদোর সঙ্গে মিলিত হওয়া।'

এপ্রিলের দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যে নাগাদ ম্যাজিস্ট্রেট ইম্পে তাঁর দল নিয়ে পৌঁছলেন গঙ্গাপাড়া। এখান থেকে খুরদা মাত্র মাইল দুয়েক।

সমস্ত দলকে থমকে দাঁড়াতে হল। আর এগোনো যাবে না।

সামনেই অবরোধ। এবং অগণ্য সশস্ত্র জনতা প্রতিরোধে উদ্বেল। ওদের সঙ্গে কয়েকটি কামান।

ম্যাজিস্ট্রেট বিচলিত হলেন। লেফটেনাণ্ট ট্রাভিসের সঙ্গে পরামর্শে বসতে হল। আর এগোনো ঠিক নয়। ওরা প্রতিরোধ করবে। এবং সামান্য সিপাহী নিয়ে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ হবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'এই নেটিভরা কামান পেল কি করে লেফটেনাণ্ট ট্রাভিস? দেখেছেন লোহার কামানগুলো?'

ট্রাভিস বললেন, 'দেখেছি স্যার। মনে হয় পর্তুগীস দস্যুরা ওদের পিছনে উস্কানি দিচ্ছে।'

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'কে জানে। হতেও পারে।'

পাইকদের তরফ থেকে মুহুর্মুহু কামান গর্জন করে উঠল।

ইংরেজসৈন্যও আত্মরক্ষার তাগিদে প্রত্যুত্তর করতে লাগল।

এদিকে রাত্রি নেমে আসছে ঘোর করে। অচেনা অপরিচিত জায়গা। সবসময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে। পাইকরা অতর্কিতে মাঝে মাঝে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

ম্যাজিস্ট্রেট বিপদ গণলেন।

'সমূহ সমস্যা। লেফটেনাণ্ট আপনি কী বলেন?'

'স্যার, সম্ভবত রাত্রিটা আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। ওদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তারপর সকাল হলে আমরা প্রাণপণে অবরোধ ভাঙবার চেষ্টা করব।'

'লক্ষ্য করছেন লেফটেনাণ্ট বাস্টার্ডস্‌রা পিলপিল করে বেড়ে চলেছে। ডার্টি নেটিভস্‌। দ্য হোল্‌ সিচুয়েশন ইজ কোয়াইট অ্যালার্মিং।'

'ইয়েস স্যার। রাত্রিটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়। আমাদের যথাসম্ভব এই খোলা জায়গায় থাকতে হবে। যেন ওরা ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করতে না-পারে।'

'দ্যাটস্‌ রাইট। ইতিমধ্যে আমি ম্যাসেঞ্জার পাঠিয়ে দিই লেফটেনাণ্ট প্রিদোর কাছে। তিনি যেন পত্রপাঠ রওনা হয়ে যান খুরদা থেকে। তাহলে শত্রুদের আমরা দুদিক থেকে পিষে মারতে পারব।'

'গ্র্যাণ্ড আইডিয়া।' লেফটেনাণ্ট ট্রাভিস মাথা নাড়লেন।

উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল। মাঝে মাঝে কামানের গর্জন। আগুনে দুটি তাঁবু পুড়ে গেল। জনতার উল্লসিত চিৎকার।

'বকশী জগবন্ধুর জয়!'

'দ্যাট ব্যারেন রাসকেল বকশী ইজ টেম্পারিং উইথ দেম্‌।' ম্যাজিস্ট্রেট বন্দী শার্দুলের মতো গজরাতে লাগলেন।

রাত্রির গর্ভ চিরে আর-একটি প্রত্যুষের প্রসব হল।

প্রিদোর খবর নিয়ে দূত ফিরে এল। ভগ্নদূত।

'তামাম খুরদা গ্রাম ভস্মীভূত। এবং কাছেপিঠে কোথাও লেফটেনাণ্ট সাহেবকে পাওয়া গেল না।

হতভম্বের মতো বসে রইলেন ম্যাজিস্ট্রেট ইম্পে। দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল তাঁর মুখমণ্ডল। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তাঁর দলের অবস্থা। এতটা খারাপ পরিস্থিতি কল্পনা করেননি। দ্রুত

বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। উপযুক্ত রসদও সঙ্গে নেয়া হয়নি। খাদ্য ফুরিয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে সংগ্রহ করারও উপায় নেই। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সিপাহীরা ভেঙে পড়েছে। এই জীর্ণশীর্ণ সিপাহী নিয়ে তিনি কী করবেন।

ওদিকে কাতারে-কাতারে জনতা ফুলে ফুঁসে উঠছে। ক হাজার হবে ওরা সংখ্যায়? দু হাজার—তিন হাজার—চার হাজার?

এখন উপায়? এখানে আর-একটি দিনও অতিবাহন করা চলবে না।

খোলা মাত্র দুটি পথ। হয় অগ্রসর নয় প্রত্যাবর্তন। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে এগোনোর অর্থ নিশ্চিত ক্ষয়, মৃত্যু। আর মৃত্যুকে কে-না ভয় করে। অতএব—

পলায়ন।

এবং যেমন ইংরেজ সৈন্য পশ্চাদপসরণ শুরু করল সশস্ত্র জনতা প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করল। ইংরেজ সৈন্য উত্তর দেয় আর পালায়। পলায়নের একটা বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব আছে। পলায়নপর দলের স্নায়ু নষ্ট হয়ে যায়। কেমন হিষ্টিরিক প্রক্ষোভ শুরু হয়।

যতদূর সম্ভব প্রশস্ত খোলামেলা পথ ধরে ইংরেজ সিপাহী পালাতে থাকল। একটু ঝোপঝাড় এলেই জনতা আড়াল থেকে আক্রমণ করছে। এই এলোপাতাড়ি আক্রমণের চোটে যে যা পারে ফেলে পালাতে লাগল। কয়েকটি তাঁবু গেল, কিছু সরঞ্জাম গেল, কিছু অস্ত্রশস্ত্র।

গোরা ম্যাজিস্ট্রেট ইম্পে জীবনে আর কোনোদিন তাঁর পৈতৃক প্রাণের জন্যে এমন দরদ অনুভব করেন নি। প্রতি মুহূর্তে জীবন সংশয়। মৃত্যু আর জীবনের সন্নিকটে ক্ষুরের আগায় ঝুলছে জীবন।

আর অবাক হচ্ছেন লেফটেনান্ট ট্রাভিসের সাহসিকতা আর বুদ্ধিমত্তা দেখে। ইংরেজ-সরকার এখনো বেঁচে আছে এই সব দুঃসাহসিক অ্যাড্‌ভেঞ্চারিস্ট অধিনায়কদের জন্যে।

একটি প্রাণও নষ্ট হতে দিলেন না ট্রাভিস। একনাগাড়ে মার্চের পর দলবল সমেত তাঁরা পুরী রোডের ওপর বালাকাটিতে নিরাপদে পৌঁছলেন। এখানে বিশ্রাম করতে হবে। সকলে অতিশয় ক্লান্ত। সেই ভোর সাড়ে পাঁচটায় রওনা হয়ে এখন বিকেল সাড়ে তিনটে। আজ এপ্রিলের তৃতীয় দিন।

বিশ্রাম সেরে আবার রাত্রি সাড়ে ন'টায় তাঁরা যাত্রা শুরু করবেন, রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে, এমন সময় বিরাট জনতা আবার আক্রমণ শুরু করল। ইংরেজ-সৈন্য কামান ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছোতে লাগল।

অবশেষে পরদিন দুপুরের দিকে তারা কটকে ফিরে এল। ছেঁড়া-খোঁড়া তাঁবু, হাতি, ভারি কয়েকটি কামান অবশিষ্ট রইল।

দপ্তরে পৌঁছেই ম্যাজিস্ট্রেট ইম্পে সরকারকে জরুরী পত্র লিখলেন:

> "This instant returned, after a most fatiguing march of a day and a night, from Khurda, I can only write for the information of His Lordship in Council that my retreat was forced, and that the whole of the Khurda territory is in a complete state of insurrection. The officer who went in command of the party which accompanied the Collector (Lt, Faris) has been killed and the whole detachment driven back to Pipli. The insurgents call upon the Raja and Jagabandhu issues orders in his name. Their avowed intention is to proceed to Puri and reconduct him in triumph to his territory."

ম্যাজিস্ট্রেট ইম্পে আরও অনুমোদন করে পাঠালেন: খুরদার রাজাকে অবিলম্বে পুরী থেকে কটকে সরিয়ে আনা দরকার এবং তার প্রতিটি সিরদারের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা করে ঘোষণা করতে হবে। অচিরাৎ রাজ্যে সামরিক আইন জারি করার প্রয়োজন।

পনেরো

লেফটেনাণ্ট প্রিদো কী করলেন ? কোথায় গেলেন ?

তিনি খুরদা অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন, এ খবর জানা যায়। কিন্তু পথিমধ্যে গুরুতর কারণে তাঁকে গন্তব্য বদলাতে হয়।

প্রিদো খবর পেলেন, সশস্ত্র জনতা পাঁচগড়ে পৌঁছে রানী মুক্তো দেবীর অট্টালিকা লুণ্ঠন করতে শুরু করেছে।

নাগপুর থেকে একদা ১৮০৬ সালে সম্বলপুরের রানী মুক্তো দেবীকে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে খুরদা রাজ্যে চালান করা হয়েছিল। তাঁর পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন কাপ্টেন রঙসেজ্। রানীর ভরণপোষণের জন্যে পাঁচগড়ে তাঁকে বার্ষিক বারো-শ'র মতো সম্পত্তি দান করা হয়েছিল।

প্রিদোর কাছে খবর এল—সশস্ত্র জনতা রানী এবং তাঁর দেওয়ানকে বন্দী করেছে। এখন হাজার পাঁচেক জনতা এগিয়ে আসছে তাঁকে আক্রমণ করতে। নেতৃত্ব করছেন স্বয়ং বকশী জগবন্ধু।

প্রিদো পাঁচগড়ের অভিমুখে ধাওয়া করবেন কিনা ভাবছেন, এই সময়ে দূত খবর নিয়ে এল।

ক্যাপ্টেন ওয়ালিংটন পাঁচগড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। যদিও তাঁকে সৈন্য দিয়ে পাঠানো হয়েছিল পুরী শহর রক্ষার জন্যে। লেফটেনাণ্ট ফ্যারিসের ওপর আদেশ ছিল তিনি যেন পিপলিতে লেফটেনাণ্ট প্রিদোর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে অপেক্ষা করেন।

এদিকে কালেক্টার অভিমত প্রকাশ করলেন লেফটেনাণ্ট ফ্যারিসকে পিপলি নয়, দেলাং-এ চলে যেতে।

লেফটেনাণ্ট গাঙপাড়ায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন অগণ্য সশস্ত্র

জনতা এই দুর্ভেদ্য অবরোধ ভেদ করে এগোনো অসম্ভব। সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশজন সিপাহী। ফিরবারও পথ নেই। আদেশ আদেশই। শৃংখলা ভঙ্গ করবার অধিকার সেনানায়কের নেই।

এগোতেই হবে। তার আগে তিনি দু'জন দূতকে পাঠিয়ে দিলেন লেফটেনাণ্ট প্রিদোর কাছে।

'অনওয়ার্ড মার্চ'—লেফটেনাণ্ট ঘোষণা করলেন।

গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম—

লেফটেনাণ্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলেন।

একজন দেশী সুবেদারও নিহত হল।

বাকি বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

লেফটেনাণ্ট প্রিদোর কাছে প্রেরিত দূত দুটিকে জনতা গ্রেপ্তার করে নাসিকা কর্তন করল।

'জয়—বকশী জগবন্ধুর জয়।'

'ইংরাজ-রাজ খতম।'

পিছনে যাবতীয় সরঞ্জাম ফেলে লেফটেনাণ্ট প্রিদো ও অবশিষ্ট সিপাহীরা পিপলির পথে দ্রুত চম্পট দিল। কটক।

এদিকে ক্যাপ্টেন ওয়ালিংটন নির্বিঘ্নে পুরীতে হাজির হলেন।

এপ্রিলের দ্বিতীয় দিন।

সমস্ত শহর শান্ত।

ক্যাপটেন খুশি হলেন। বিনা যুদ্ধেই জয়লাভ। অতঃপর একমাত্র কাজ—বিদ্রোহী জনতার পিছনে ধাওয়া করে ইঁদুরের মতো পিষে মেরে ফেলা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কর্তৃপক্ষকে লিখলেন একঝাঁক সৈন্যকে এই বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য পাঠিয়ে দিতে।

সেই পরামর্শ মতো এপ্রিলের নয় তারিখে ক্যাপটেন লে ফেভার সাড়ে পাঁচশো সিপাহী এবং কিছু কামান নিয়ে খুরদা অভিমুখে রওনা হলেন। একই রাস্তায়, যে রাস্তা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ইম্পে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন।

এপ্রিলের বারো তারিখে তামাম খুরদা রাজ্যে সামরিক আইন জারি করে দেয়া হল।

চারদিকে থমথমে পরিস্থিতি।

নিঃশব্দে জনতা জমা হয়েছে। পুরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থকুল গ্রামে। সারাদিন শান্তিতে অতিবাহিত হল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। তরল অন্ধকারে গলিত লাভা স্রোতের মতো সশস্ত্র জনতা লোকনাথ গেট পেরিয়ে পিলপিল করে শহরে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যার শহর চমকে উঠল। আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সরকারী কাছারি, সরকারী ভবন।

তাদের বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে রেখে জনতা সেদিনকার মতো গা-ঢাকা দিল।

সমস্ত শহর ভয়ার্ত আতংকিত মূষিকের মতো। শহর ছেড়ে আমলারা ভেগেছে সমুদ্রের দিকে। সাহেবস্থবোদের বাস এখানে। গোরা সৈন্য সিপাহীরা গিজগিজ করছে এখানে।

গোরা সিপাহীদের রাখা হয়েছে লবণের এজেণ্ট বীচার সাহেবের বাঙলোর সামনে। চিলকায় ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছেন সাহেব। তাঁর ভয় উদ্বেগ দ্বিগুণিত হয়ে উঠেছে।

পরদিন এপ্রিলের তেরো তারিখ। প্রত্যুষে সশস্ত্র জনতা জমায়েত হল শহরের পুবদিকে।

তারপর শুরু হল মুহুর্মুহু আক্রমণ—

গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম!

ইংরেজ সিপাহীরাও শুরু করল প্রত্যুত্তরে গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম।

তুটি ঘণ্টা লড়াই চলল সমানে।

শেষপর্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত ইংরেজ-সৈন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতার ওপর। জনতা এই মরিয়া আক্রমণের ঝোঁক সামলাতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়ে এদিক-সেদিক পলায়ন শুরু করল।

জন পনেরো জনতা নিহত হল। আহতও হল কিছু বেশি।

ঘাম মুছতে মুছতে সিপাহী ফিরে এল।

কিন্তু কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কখন কোন্‌দিক দিয়ে বিপদ এসে হামলা করবে, কেউ বলতে পারে না। এদিকে রসদপত্র ক্রমশ ক্ষয় হয়ে আসছে। শহরের যা অবস্থা, খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করা সম্ভব নয়।

এদিকে সংবাদ এল শহরের হৃৎপিণ্ডে সশস্ত্র জনতা জমায়েত হয়েছে। কাতারে কাতারে লোক আসছে। মন্দিরের পাষণ্ড পূজারীরাও অস্ত্র নিয়ে নেমে এসেছে। স্থানীয় অধিবাসীরাও যোগ দিয়েছে জনতার সঙ্গে।

মন্দির থেকে একনাগাড়ে ঘণ্টা বেজে চলেছে—ঢং—ঢং—ঢং—

পুরোহিত উচ্চ মঞ্চ থেকে ঘোষণা করল : 'ইংরেজ-রাজত্ব শেষ হয়েছে। এখন মহারাজা মুকুন্দদেবকে হৃত সিংহাসনে বসাতে হবে।'

উল্‌কার মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন বকশী জগবন্ধু। সঙ্গে আরও কয়েকজন সিরদার। মহারাজার নামে আদেশ জারি করছেন বকশী।

'জয়—মহারাজ মুকুন্দদেবের জয়!'

'জয়—বকশী জগবন্ধুর জয়!'

'ইংরাজ রাজ খতম।'

মন্দিরের ঘণ্টা বেজে চলেছে—ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—

বকশী এবার আর ভুল করলেন না। আক্রমণ-ভাগকে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে প্রস্তুত করে তুললেন। একসঙ্গে চারদিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। তিনদিকের পথ অবরোধ করে দাঁড়াতে হবে। সমুদ্র দিয়ে যাতে পালাতে না পারে তার জন্য সমুদ্রেও পাহারা থাকবে।

যুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠল।

ইংরেজ কর্মচারীরা চতুর্দিকে বিভীষিকা দেখলেন।

ক্যাপটেন ওয়ালিংটন বললেন,* 'এখন এই অবস্থায় আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠব না। অকারণ লোকক্ষয় হবে। আমাদের আশু লক্ষ্য-সরকারী ট্রেজারি রক্ষা করা।'

অতএব—

'অতএব একটি মাত্রই পথ—পলায়ন করা।'

'কিন্তু কোন্ পথে আমরা যাব?'

'পুবদিকের পথ এখনও খোলা আছে। অলক্ষ্যে এই পথ দিয়েই দ্রুত পালাতে হবে।'

আর দেরি করা নয়। ত্বরিতে সকলে প্রস্তুত হয়ে উঠল। ক্যাপটেন তাঁর সিপাহীদের আগে-পিছনে রাখলেন। দলে রইলেন লবণের এজেণ্ট দু'জন কিং ও বীচারসাহেব। তীর্থ-কর আদায়ের কালেক্টর বুস্‌বি।

এপ্রিলের আঠারো তারিখে এই দল কটকে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ষোল

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসস্তূপের ওপর নিঃশব্দে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বকশী জগবন্ধু। বিকেলের গোধুলি-সূর্য সমুদ্রের পারে অস্ত যাচ্ছে। দূর থেকে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি বায়ুস্তরে ভেসে আসছে। কেমন বিষাদ উদাস-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বকশী। ঝাউগাছের মাথা থেকে সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে, হাওয়ায় জলের শব্দ।

এতদিনের উত্তেজনার মধ্যে কেমন জ্বরজ্বর প্রদাহে আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। এখন উত্তেজনাগুলি গলে গিয়ে পরিপূর্ণ শান্তি বোধ করছেন বকশী। এবং এই শ্রান্তি তাঁকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। তাঁর চোখে ভাসছে পার্বতীর মুখ, স্ত্রী সত্যভামা আর রোড়াং-এর প্রসন্ন সবুজের আহ্বান। তিনি যেন একবুক ধানের শিষের মধ্যে ডুবে গেছেন, নাসারন্ধ্র ভরে উঠছে সৌরভে।

জনতার বিজয় উল্লাস এদিক-সেদিক থেকে বাতাসে ভর করে আসছে।

বকশী জয়ের কথা ভাবছেন না। তাঁর হৃদয়ে একটা বিচ্ছিন্ন দুঃখ শ্লোকের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি। এবং সেখানে তিনি নির্জন, নিঃসঙ্গ। কেউ বিশ্বাস করবে না তিনি কতখানি রিক্ত হয়ে পড়েছেন। দু'একদিনের মধ্যেই তিনি খুরদায় ফিরে যাবেন। কিন্তু পার্বতী যদি তার কাছে না আসে।

'কে ?'

'আমি কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধর—'

'হ্যাঁ। তোমার কথাই ভাবছিলাম। তারপর, মহারাজার কাছে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী বললেন তিনি?'

'মহারাজা তো বিশ্বাসই করতে চান না—আমরা ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কী জানেন প্রভু, তাঁকে দেখে মনে হল আমাদের পছন্দ করছেন না। কেমন এড়িয়ে যেতে চাইছেন।'

'তাঁর ভয় যায়নি এখনো।' বকশী হাসলেন: 'আঠারো শ' চারের কথা মনে পড়ছে হয়তো। অথচ তিনি জানেন না, এটা আঠারো শ' সতেরো। অনেক তফাত।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললে, 'মহারাজা আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। তাঁকে আমরা পৈতৃক সিংহাসনে অভিষেক করতে চাই শুনে তিনি কেমন চঞ্চল অস্থির হয়ে উঠছেন।'

বকশী বললেন, 'ঠিক আছে। আমি তাঁকে বোঝাব। আমার অনুরোধ তিনি ফেলতে পারবেন না।'

'কী জানি প্রভু, আমার তো মনে হয় তিনি বেকায়দায় পড়লে আমাদের বলি দিতে ছাড়বেন না।'

'কৃষ্ণচন্দ্র, তিনি আমাদের মহারাজা। কর্তব্য উভয়দিক থেকেই। উৎসবের আয়োজন করো। রাজ-অভিষেকের যেন কোনো ত্রুটি না হয়।'

কৃষ্ণচন্দ্র চলে গেলেও বকশী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর পদব্রজে এগোলেন শহরের দিকে।

কৃষ্ণকায় লোকটা গড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

বকশী একটু চমকে উঠেছিলেন।

'দেবতা--'

লোকটার কণ্ঠস্বর যেন দূরস্মৃতি অবগাহন করে ভেসে এল। বকশী যৌবনের গন্ধ পাচ্ছেন। তাঁর ভালোবাসার স্মৃতি। সত্যভামা। বকশীর সমগ্র মন পদ্মগন্ধে ভরে ওঠে। যৌবনের আরক্ত স্বেদে ঘামছেন তিনি।

'তুমি !'

'আমাকে চিনতে পারছেন না গো. দেবতা ?'

'দীপ...' যৌবনের গোলাপবনে যেন দ্বিতীয়বার হারিয়ে গেলেন বকশী।

'আমার কী করলেন, দেবতা ?' একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কালি ধুলোয় মলিন।

নুরানের মাথা-মুড়ানো রক্তখিন্ন কলেবর বকশীর চোখের পরদায় দুলে উঠল। নুরানের স্মৃতি কী ভুলে গিয়েছিলেন তিনি ? অত্যাচারে উন্মাদিনী নুরান। স্বজন বিরহের বেদনা তাঁকে দীপের সহমর্মী করে তুলল। একটি মেদুর দার্শনিকতা পুনর্বার বকশীকে উদাস করে দিল। দীপকে কী তিনি বলবেন, যাকে আমরা ভালোবাসি তাকে ধরা যায় না। খেপা খুঁজে খুঁজে ফেরে মাণিকরতন...

বকশী নিঃশব্দে পালিয়ে এলেন।

মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই জনতার উদ্বেল কণ্ঠস্বর তাঁকে নির্জনতার গ্রাস থেকে উদ্ধার করল। এখন তিনি জনতায় মিশে জনতা। তাঁর একক মনের কণ্ঠস্বর এখন বিচিত্র সমস্বরে ডুবে গেল। জনতাকে নিরীক্ষণ করলেন তিনি। আশ্চর্য ! এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, আকারে-ইঙ্গিতে, গতিবেগে, চলায়, ভাষায় এক স্বর মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হচ্ছে। বকশীর মনে হল, ওরা এক-সত্তাবিশিষ্ট এক বিশাল প্রাণী। চোখের সামনে ওরা এক বিস্তৃত আবেগের বন্যায় হারিয়ে গেছে। ওরা এক নির্দিষ্ট ভাব-প্রতীক পেয়েছে।

'জয় – বকশী জগবন্ধুর জয় !'

বকশী স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ওরা তাঁর জয়ধ্বনি করছে কেন ? ওরা কেন বোঝে না যে এই জয়ধ্বনি ওদের নিজেদেরই। বকশী নিজেকে চেনে, নিজের শক্তিকে চেনে।

বকশী রাজপ্রাসাদের অভিমুখে ধাবিত হলেন।

গোটা খুরদা রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীপের মতো ভাসছে। ইংরেজ সৈন্যের কোনো সংবাদ মিলছে না।

এই সময় দূত দুঃসংবাদ কাঁধে করে নিয়ে এল।

বিশাল সৈন্যবাহিনী ও কামান নিয়ে অগ্রসর হয়ে পড়েছেন ক্যাপটেন লে ফেভার। এপ্রিলের ষোল তারিখে তিনি খুরদা ছেড়েছেন এবং পুরীর উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। পথে আসতে-আসতে তিনি পাইক-বসতি নির্মমভাবে ধ্বংস করে ফেলেছেন। বাজপুর গেছে, কদলিবাড়ি গেছে। সন্ধ্যাবেলায় তিনি তপং পৌঁছে অপেক্ষা করছেন।

পরের দিন দূত খবর নিয়ে এল। ক্যাপটেন কানাস পৌঁছেছেন। এবং সন্ধ্যের দিকে মুনা নদী পার হয়ে বামতটে মুয়াগাঁ পল্লীতে শিবির স্থাপন করেছেন।

বকশী সিরদারদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় বসলেন।

'পরদিন সকালে দোবান্ধায় আমাদের আক্রমণ করতে হবে। গোরা-সৈন্যদের বাঁধ পেরোতে দেয়া হবে না।'

রাত্রির অন্ধকারে সহস্র জনতা বাঁধের পেছনে জমায়েত হল।

ভোর হতেই লে ফেভার দেখলেন সশস্ত্র জনতাকে। অবরোধের প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছে। তিনি এক মুহূর্ত ভেবে রণকৌশল স্থির করে ফেললেন। ওদের হাতে গাদাবন্দুক, বর্ষা, তীর-ধনুক। সংখ্যায় ওরা অজস্র। লোকবলে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। ওদের প্রথম থেকেই প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দিতে হবে।

ক্যাপটেন লে ফেভার আর কালমাত্র দেরি করলেন না। ঝড়ের মতো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

গুড়ুম—গুড়ুম···গুড়ুম!

সৈন্যবাহিনীকে তিনি তিন ভাগে সজ্জিত করে তুললেন। এক দল দক্ষিণে, একদল বামে। আর মধ্যভাগে তিনি অন্য সিপাহী নিয়ে সোজা ঢুকে পড়বেন।

সম্মুখযুদ্ধের এমন কৌশলে জনতা অভ্যস্ত নয়। তারা আক্রমণ প্রাণপণে প্রতিহত করল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত বিশৃঙ্খল হয়ে তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।

ক্যাপটেন বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না। জনতা কিছু বোঝবার আগেই সৈন্যসহ গণ্ডারের খড়েগর মতো এগিয়ে গেলেন।

এবং এপ্রিলের আঠারো তারিখ, বেলা ছুটোয় নিয়তির মতো পুরীতে পদার্পণ করলেন।

বিদ্যুতের মতো ইংরেজ-সৈন্যের আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়ল।

বকশী এই সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আপাতত পুরী নয়। অন্য কোথাও, অন্য কোনো স্থান থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধরকে আদেশ করলেন কানাস চলে যেতে। আর নিজে ছুটলেন বানপুরের পথে।

মহারাজা মুকুন্দদেব ষোলজন পাইকসহ পলায়নের আয়োজন করছিলেন। মূর্তিমান শমনের মতো ক্যাপটেন লে ফেভার উদয় হলেন।

'রাজা, আপনি পালাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমার বন্দী।'

মুকুন্দদেব বললেন, 'দোহাই সাহেব, আমি এসবের মধ্যে ছিলাম না। ওই বকশী জগবন্ধু—'

ক্যাপটেন বললেন, 'আমি আপনার বিচারক নই, রাজা; আমার সরকার তার বিচার করবে। ততদিন আপনি আমার বন্দী।'

কড়া পাহারা বসিয়ে ক্যাপটেন বিশ্রাম করতে গেলেন। পুরী শহরের এই পরিস্থিতির খবর ক্যাপটেন আগে জানতে পারেন নি। একজন ইংরেজ কর্মচারীও নেই। ক্যাপটেন ওয়ালিংটন শহর থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, এ খবরও তিনি জানতেন না।

এখন কী কর্তব্য!

বানপুরে বকশী জগবন্ধুকে ধাওয়া করবেন!

অথবা, কানাসে সিরদার কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধরকে।

তার আগেই কর্তৃপক্ষের আদেশ এল: 'রাজাকে কটকে চালান করো।'

শহর দখল করা এবং মহারাজকে গ্রেপ্তারের জন্তে এপ্রিলের বাইশ তারিখে মেজর হ্যামিলটনের পুরীতে পৌছবার কথা ছিল।

ক্যাপটেন লে ফেভারের অভাবনীয় সাফল্য মেজরের যাত্রাকে পিছিয়ে দিল।

এপ্রিলের আটাশ তারিখে মেজর হ্যামিল্‌টন পুরীতে এলেন।

মেজরের হাতে শহরের দায়িত্ব অর্পণ করে ক্যাপটেন লে ফেভার বন্দী রাজাকে নিয়ে রওনা হলেন।

পিপলিতে রাজাকে মুক্ত করবার জন্যে আড়াই হাজার জনতা শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

এগারোই মে বন্দী রাজা কটকে পৌছলেন।

এবং কটক দুর্গে পুনরায় তাঁকে আটক করে রাখা হল।

মহারাজা বন্দী হবার পরও বকশী দমলেন না। একবার হেরেছেন আগামীতে জয়লাভ করবেন না—কে বলতে পারে। খুরদা এবং পুরীতে আবার ইংরেজ-সরকার তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

বকশী কোনো কিছুতে ভয় পান না। হাতের শেকল ছাড়া তাঁর আর হারাবার কী আছে! বিদ্রোহের অগ্নিকে তিনি প্রজ্বলিত করে রাখবেন। আবার প্রস্তুত করতে হবে জনতাকে। উল্‌কার মতো তিনি ছুটলেন এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। নয়াগড়, দাসপাল্লা, রানপুর, বাউদ। পুরী শহর ছেড়ে ছুটলেন গঞ্জাম। শেরগড়, খালিকোটা, গুমসুর।

তারপর চোখের সামনে দেখ[illegible] কুজান ও কনিকার পাইকরা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরল। [illegible] ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন— কুজাং-এর রাজা বেগতিক দেখে, কেমন বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তাঁর দুই সিরদার নারায়ণ পরমগুরু ও বামদেব পটযোশীকে ধরিয়ে

দিলেন। কিন্তু রাজা নিজে কী রক্ষা পেলেন? তাঁর এক বছর কারাবাস হল। আর হতভাগ্য সিরদার দু'জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গেলেন।

দেখতে দেখতে দীর্ঘ আটটি বছর কেটে গেল।

এক-এক করে নেতারা ধরা পড়লেন। কেউ ফাঁসিমঞ্চে এগিয়ে গেল, কেউ গেল দীর্ঘ কারাবাসে, কেউ দ্বীপান্তরে।

বকশী এই দীর্ঘ বছর বিশ্বস্ত খণ্ডদের সঙ্গে গুমসুরের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আত্মগোপন করে রইলেন।

উপসংহার

আঠারো শ' পঁচিশ।

বকশী আত্মপ্রকাশ করলেন।

সরকার তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে ঘোষণা করেছেন: 'বকশী স্বেচ্ছায় ধরা দিলে তাঁর সঙ্গে উদার ও মহানুভব ব্যবহার করা হবে।'

ইতিপূর্বেই তাঁর পরিবারকে কটকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাদের ভরণপোষণের জন্যে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাতা দেয়া হচ্ছে।

এবং সরকার আরও আশ্বাসবাণী শোনাল: 'বকশীর জীবন রক্ষা করা হবে। তাঁকে কটকে বাস করতে হবে। মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করা হবে। এবং মাসিক দেড়শ' টাকা বৃত্তি দেয়া হবে।'

বকশী কটকের পথে পা বাড়ালেন।

পিছন ফিরে একবার দেখলেন, কেউ নেই। আর কোনোদিন শ্মশানশয্যা থেকে তাঁর পাইকবাহিনী উঠে আসতে পারবে না।

মৃত মানুষ শ্মশান থেকে উঠে আসে না।

জীর্ণ-শীর্ণ নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল বকশী দুস্তর পথ অতিক্রম করে চললেন।

প্রয়োজনশেষে নিষ্ঠুর ইতিহাস-বিধাতা তাঁকে কালের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন।

'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' বকশী নিশ্বাস ফেলে বললেন॥